Neel Bharani

Gargi Bhattacharya

******

COPYRIGHTED

MATERIAL

নীল তরণী

গার্গী ভট্টাচার্য

স্পিরিট ওয়ার্ল্ড নিবাসী সব আত্মীয়-পরিজন , বন্ধু , শুভাকাঙ্খী

আর পশুপাখি সঙ্গীদের ----

ভ্রমরকালো ছায়া মানুষ

রং-পাহাড়ে পা ডুবিয়ে , সঙ্গী আমার ।

তুন্দ্রা আর নেই ,

অন্তবিহীন রোদের কণা বরফে বরফে !

মুখোশ খুলে সবাই আজ

বার্চ বনে করছে শিশির স্নান ,

মানুষ নয় , ঐশ্বরিক ওরা !

পার্থিব সাঁঝে, হরষে বিষাদে,

প্রেত চেতনারা ।

----------গার্গী

শিস্

কেমিক্যাল বিজ্ঞানী চিত্ররূপ কর আর তার স্ত্রী রতি মিত্রর মধ্যে বনাবনি একেবারেই নেই । অবস্থা এতদূর গড়িয়েছে যে আত্মীয় পরিজন ওদের বাড়ি আসতে কিন্তু কিন্তু করে । দোতলা বাড়ি । ওপরে থাকে চিত্ররূপ । নিচে তার একমাত্র দাদা অরূপ । টেকনিক্যালি এই ব্যবস্থা । আসলে সবাই মিলেই বাড়িটা জুড়ে থাকে।

ওরা দুইভাই । বাবা ও মা গত হয়েছেন তা প্রায় দশ বছর হল । বাবা ওকালতি করে ভালই টাকাপয়সা করেন । খাস কলকাতা শহরে এই বিশাল দোতলা ,বাগানযুক্ত সুন্দর বাড়িটি তৈরি করতে সক্ষম হন । তখন মানুষের হাতে এত সফট্ওয়্যার আর রিয়ল এস্টেটের টাকা ছিলো না । মধ্যবিত্ত শ্রেণী তখনও একটা সীমারেখার মধ্যেই চলাফেরা করতো ।

অভিজাত কফিশপের নীলাভ আলো কখনো কখনো তাদের মেক আপ , ট্যাটু করা শরীর ছুঁয়ে যেতো না ।

বাড়ির নাম দেওয়া হয় আঁচল । মায়ের আঁচল আরকি ! রুচিপূর্ণ এই বাড়ির একতলাটি নেয় অরূপ । তার একটিমাত্র মেয়ে তিতাস্ । অরূপ পেশায় শিক্ষক । কলেজে পড়ায় । বিষয় বটানি । এম-এস -সি পাশ । ডক্টরেট করেনি । ওর স্ত্রী , কুমকুম কেমিস্ট্রিতে ডক্টরেট !

চিত্ররূপের স্কুল/ কলেজের সহপাঠিনী । বৌ পি-এইচ-ডি আর অরূপ সেটা করেনি কেন , কেউ জানতে চাইলে ও বলতো : আমি করিনি ও সময় ও এফর্ট দিয়ে করেছে এই আর কি । তফাৎ এইটুকুই ।

অনেক বাচাল জানতে চাইতো : এত লেখাপড়া জানা মেয়েকে কন্ট্রোল করতে পারো ? প্রবলেম হয়না ?

অরূপ হেসে এড়িয়ে যেতো । ওর ভাই চিত্ররূপ আর স্ত্রী কুমকুমের জগতে দুই ধরণের মানুষই আছে --- পি এইচ ডি আর নন পি এইচ ডি । একদল চিন্তাশীল অন্যদল নিতান্তই বোকা ।

কখনো কখনো অরূপ মজা করে বলে : কিন্তু আজকাল তো লোকে থিসিস্ কপি করে লেখে । অথবা গাইড লিখে দেয় । তারা কোন দলে পড়বে ?

ওরাও হেসে ফেলে, বলে : আমরা জেনুইন স্কলারদের কথা বলছি ।

ওদের কাছে ক্লাসে ফার্স্ট হওয়া মানে বিরাট ব্যাপার । সেইসব ছাত্রছাত্রী বাংলা গল্প ফল্প পড়েনা । গল্প উপন্যাস নাটক নভেল এইসব অত্যন্ত চটুল লোকেদের কাজ কারবার । ওরা ইন্টেলেকচুয়াল । নিজ চিন্তায় মগ্ন হয়েই দিন কাটায় । অন্যরা নেহাৎই কীটপতঙ্গ । মনুষ্য জ্ঞান করেনা । মানুষের পর্যায় পড়বে তবে তো সম্মান পাবে ?

পি এইচ ডি পটিয়সী কুমকুমমণি , চোখ বেঁকিয়ে বলতো : পি এইচ ডি আর নন পি এইচ ডি । শুধু দুটো ক্লাস আছে ।

সমস্যা তাতে হয়নি । সমস্যা শুরু হয়েছে দুজনে ক্লাসমেট হওয়ায় । দুজনে দুজনকে নাকি পছন্দ করতো । একসাথে ট্রেকিং করতেও গিয়েছিলো বেশ কয়েকদিনের জন্য ঝাড়গ্রামে ।

পরে ওদের বাড়ি থেকে অরূপের সম্বন্ধ যায়, রূপসী কুমকুমের সাথে । কাজেই বিয়ে হয় দাদার সাথে তার । এমনই লোকে মনে করে ।

কিন্তু চিত্ররূপের স্ত্রী রতির মনে ঘোরতর সন্দেহের ছায়া । চিন্তার মেঘ । লোকে বলে ওদের নাকি একসাথে লেকে ও নানান পার্কে দেখা গেছে । কেউ কেউ ক্ষয়প্রাপ্ত ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালেও দেখেছে , হাত ধরে ঘুরছে । ওদেরই এক নিকট আত্মীয়া, একদিন এই বাড়িতেই ওদের আলিঙ্গন আবদ্ধ অবস্থায় দেখেছে , এলোমেলো কুমকুম !

অগ্রজের পত্নী হওয়া সত্ত্বেও এরকম ব্যবহার বেদনাদায়ক । কিন্তু হাতেনাতে কোনোদিন রতি ওদের ধরতে পারেনি ।

ওদের মৈথুন ও রতিক্রিয়া অধরাই থেকে গেছে ।

রতির বান্ধবী, নার্স অমরাবতী বলে -- সন্দেহ করতে যাস্‌না, মারা পড়বি ।

তুই তো কিছুই দেখিস্‌নি, সবটাই লোকমুখে শোনা । লোকে অনেক আজেবাজে কথাও বলে । যেহেতু ওরা ক্লাসমেট ছিলো তাই অনেকেই মজা দেখার জন্য হয়ত বাজারে এই গল্প ছড়িয়েছে । তোর সুখশায়রে বিষ ঢালার জন্যে । এগুলো নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে তুই জীবনকে উপভোগ কর । ওদের ক্রিটিকদের চোখ ছানাবড়া হয়ে যাবে তখন ।

ভুলে যাবার অনেক চেষ্টা করেছিলো রতি কিন্তু মনের গহীনে এক অসহ্য যন্ত্রণা । হঠাৎ হঠাৎ আক্রমণ করে হৃদয় কুঠুরি থেকে বেরিয়ে এসে । তাই হয়ত একদিন রমণকালে যখন মানুষ স্বর্গসুখ অনুভব করে ঠিক সেইসময় রতির মুখ থেকে বেরিয়ে পড়ে -- এখন কি তুমি ভাবছো যে তুমি দিদিকে করছো ?

সেই অবস্থা থেকে লাফ দিয়ে উঠে পড়ে চিত্ররূপ, অবিশ্বাস্য! অসম্ভব কঠোর মুখ করে বলে ওঠে : ছিঃ ছিঃ ছিঃ ! এই নোংরা কথাটা তুমি মুখ দিয়ে বার করতে পারলে ? এত নিচে নেমে গেছো তুমি ?

তারপর থেকে সে আর রাতে ওদের ঘরে শুতে আসতো না । কেন কেউ জানে না । ডাইনিং রুমে একটা ডিভান ছিলো । ঘরটা খুব বড় । সেই ডিভানে শুয়ে রাত কাটাতো । সাথে ওদের কুকুর : জিকা ।

জিকা , চিত্ররূপের খুব ন্যাওটা । রাতেও এবার থেকে একসাথে শোয় ।

বাড়ির বড়রা বেশ কয়েকবার বলেছে ওকে স্ত্রীর সাথে শুতে । ও রাজি হয়নি । এরপর এক অদ্ভুত নীরবতা ওদের মধ্যে ।

কেউ কারোর সাথে কথা বলেনা । রতি কয়েকবার চেষ্টা করেছে । চিত্র-ওকে কড়া কথা বলে পাশ কাটিয়ে গেছে ।

বৌদি কুমকুম বলেছে : কোন বর-বৌয়ের মধ্যে না ঝামেলা হয় ? কিন্তু রাতের পর রাত আলাদা শোয়া , বলে যেন মুচকি হেসে নিয়েছে ---এমন কোনোদিন দেখিনি বাপু ! এন্ড অফ দা ডে সবার ঐ কথাগুলি মনে রাখা উচিৎ , ঐ ম্যারেজ স্টাফ-- for better, for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health, to love and to cherish, till death do us part-----

রতির গা পিত্তি জ্বলে গেছে : মনে মনে বলেছে : ইউ ফাকিং বিচ- তুই এরজন্যে দায়ী । নিজে তো রাতের পর রাত বরের বাহুবন্ধনে এনজয় করছিস্ ! তোর মতন মহিলার, চাব্‌কে, পিঠের ছাল তুলে দেওয়া উচিৎ ।

রতির এহেন অবস্থা দেখে একদিন ওর এক বয়স্ক আত্মীয়া বলেন : বৌমা, তুমি কয়েকদিন কোথাও ঘুরে এসো , দেখবে ততদিনে হয়ত স্বামীর মন ফিরেছে ।

কিন্তু এখানে রতির কেউ নেই । ওর মা বিদেশে থাকেন । আগে ওরা ভারতেই ছিলো । বাবা মারা যাবার পরে ওর মা আবার বিয়ে করে বিদেশে পাড়ি দেন । দ্বিতীয় স্বামী বা ওর

পাপা একজন ড্যানিশ মানুষ । ভারতে যোগব্যায়াম শিখতে আসেন । ওর মা ছিলেন যোগব্যায়ামের শিক্ষক । দুজনের ভাব ভালোবাসা হয় । পরে ওরা বিদেশে চলে যায় । কাজেই রতি বিদেশে বেড়ে ওঠে । ওর দুই সৎ ভাই আছে । ওরা আমেরিকাতে থাকে । ওর সাথে যোগাযোগ কম । চিত্ররূপের সাথে সম্বন্ধ নিয়ে আসে মায়ের এক কাজিন । সম্বন্ধ করেই বিয়ে হয় ওদের । রতিকেও দেখতে ভালো । তবে কুমকুম যদি হয় ঐশ্বর্য রাই তাহলে রতি পুণম ধিঁলো ।

কে বেশি রূপসী পাঠক বিচার করবেন । বিদেশে রতি কাজ করতো সোনোগ্রাফার হিসেবে । মানুষের আল্ট্রাসাউন্ড করা ছিলো ওর কাজ । এখানে এসে আপাততঃ কাজ করেনা । সেলাই ফোঁড়াই করে দিন কাটায় । মনও ভালো না কাজেই কাজের ইচ্ছেও চলে গেছে ।

রূপের হাটে তো হার মানেনি রতি, মনের হাটে মেনেছে । আগে থেকেই যাকে মন দিয়ে বসে আছে ওর বর, তাকে বিয়ের পরেও ২৪/৭ বাড়িতে দেখলে কেমন লাগে ? বুকের ভেতরে তখন কি চলে , কিইবা হয় ?

যা হয় বা হতে পারে যে কোনো রক্তমাংসের, তাই হচ্ছে চিত্ররূপের ।

নাহলে একদিন এক কফিশপে , ওর বন্ধু তমাল যখন জানতে চাইবে (রতি তখন ওয়াশ-রুমে গিয়েছিলো , ফেরার সময়

ওভারহিয়ার করে) কুমকুমকে নিশ্চয়ই এখন অন্যভাবে দেখিস্? তখন চিত্ররূপ কেন বলবে - ভালো আমি ওকে এখনও বাসি । কিন্তু সব ভালোবাসার পরিণতি বিয়ে নয় । সামনের জন্মে দেখা যাবে !

--তুই বিজ্ঞানী হয়ে পরজন্ম মানিস্ ?

--কুমকুমের জন্যে আমি পরজন্ম কেন স্বর্গ নরকেও বিশ্বাসী - -বলে দুজনেই হেসে ওঠে !

সেদিন রাতে ওকে একটু ঘুরিয়ে রতি জিজ্ঞেস করে , আচ্ছা কাউকে কেউ ভালোবাসলে যদি বিয়ে নাহয় তখন মানুষ কী করে ?

চিত্ররূপ বলে ওঠে খুবই সাবলীল ভাবে : পরস্পরের উপকারে কাজে আসে , শুভকামনা পাঠায় আর প্ল্যাটনিক প্রেম ধরে রাখে ।

মুখটা গম্ভীর করে রতি বলে : আমার ফার্স্ট ফ্লেম কে জানো ?

বিস্মিত চোখ মেলে চায় ওর বর , বলে - সে কে ? আমার জানা নেই ।

রতি মিষ্টি হেসে বলে ওঠে : তোমার হিংসা হবে না তো ?

--না ।

-কেন ?

-কারণ ওটা পাস্ট আর আমি পাস্ট নিয়ে মাথা ঘামাই না ।

রতি মনে মনে বলে : ঐ বিচ্‌টা তোমার পাস্ট কেন নয় ?

মুখে বলে -- আমার ফার্স্ট লাভ একটি টেডি বিয়ার । হ্যাঁ একটি বিয়ার । বিয়ার পান করতে করতে আমি ওর সাথে ফ্লার্ট করতাম । স্টিল আই লাভ হিম । হি ওয়াজ ট্রয় । মাই টয় , মাই লাভ ট্রয় , সেক্স টয় ! বলেই উচ্চস্বরে বাড়ি কাঁপিয়ে উন্মাদিনীর মতন হেসে ওঠে ।

চিত্ররূপ অবাক হয়ে চেয়ে থাকে । রতির হঠাৎ ক্ষেপে ওঠা অবয়ব যেন কাঁপছে থরথর করে !

আরেকবার ওকে হাতেনাতে ধরে । জন্মদিনে ঐ হতচ্ছাড়িকে গ্রিটিং দেয় ওরা । তাতে নিচে চিত্র লিখে দেয় : ফ্রম রতি অ্যান্ড চিত্র উইথ লাভ ---

সাথে সাথে লাভ শব্দটি কেটে লাল পেন দিয়ে লিখে দেয় রতি , হুইশেস্ ।

চিত্র বিরক্ত হয়ে বলে : এইভাবে লাল কালি দিয়ে কাটলে কেন ? আর হুইশেস্-ই বা লিখলে কেন ?

চোখ পাকিয়ে রতি বলে ওঠে : অন্যের বিবাহিতা স্ত্রীকে পরপুরুষ হুইশ-ই পাঠায় । যারা লাভ দেয় , দে আর lechers----

এখন তো ওরা একসাথে শোয়না । দিনের বেলা মুখোমুখি যাতে না হয় তার জন্যে সবরকম ব্যবস্থা নেয় চিত্ররূপ । আর হয়ে গেলে মুখ ঘুরিয়ে চলে যায় । কাজেই রতিও আজকাল সেটাই করে ।

চিত্ররূপ ,একটি কেমিক্যাল ফ্যাক্টরিতে কাজ করে । চিফ্ কেমিস্ট । আর কুমকুম একটি পেস্ট কন্ট্রোল কোম্পানিতে ম্যানেজার । সম্প্রতি উকুনের এক অভিনব ওষুধ বাজারে এনেছে ওদের কোম্পানি , তাই নিয়ে খুব মাতামাতি করে ।

ওর মেয়ে তিতাস্ এর মাথা ভর্তি উকুন ছিলো । স্কুলে, উকুনের মড়ক লাগে । তখন মাথায় করে নিয়ে আসে । এখন এই ওষুধ দিয়ে সব চলে গেছে । বাজার চলতি ওষুধে উকুন তো মরে যায় , ওদের বেবীরা থেকে যায় ।

এখন সেই নিট্গুলিও, এই নতুন ওষুধে একদম ১০০ ভাগে মরে যায় ।

ওষুধ স্প্রে করে দেয় মাথায় । ধোঁয়ার মতন দেখতে । নাম **লাইসিলা-ট্রু** ।

সব দেখেশুনে রতি মনে মনে বলে : এবার তোর কোম্পানিকে বল বজ্জাতি পোকার স্প্রে বার করতে ।

তোর মতন বজ্জাত মহিলাগুলো ,যেগুলো নিজের ঘর বাঁচিয়ে অন্যের ঘর ভাঙে সেগুলোর মাথার পোকাগুলো স্প্রে করে নির্মূল করতে---- নিজে তো রোজ রাতে দরজা বন্ধ করে, বরের আদর,সোহাগ খাস্ ,অত বড় মেয়ে থাকতেও । আমার বর তো তোর জন্যে ডাইনিং হলে শোয় । হয়ত রাতে বাথরুমে যাবার নাম করে ওখানেও চুমাচাটি চালাস্ ---তা এগুলো মাথায় পোকা না থাকলে এমনি হয় ?

কাজেই বজ্জাতি পোকার ওষুধ!

কতকটা বিরক্ত হয়েই রতি আজকাল খুব ডেয়ারিং হয়ে উঠেছে । মাঝেমাঝে বন্ধুরা বলে ডাইভোর্সের কথা। কিন্তু ও চিত্ররূপকে খুবই ভালোবাসে । কাজেই ছেড়ে যেতে মন চায়না । আর এত সহজে হার মানবে বিচের কাছে ?

মা ও পাপা বলেছেন বিদেশে ফিরে যেতে । সৎ ভাইরা বলেছে : আগেই বলেছিলাম ডোন্ট গো ফর দিস্ ইন্ডিয়ান langur---বিয়ের আগে এগুলোর সাইজ কত তুমি জানতে পারবে না , মেয়েগুলোর কোনো এক্সপিরিয়েন্স থাকেনা , প্রথম রাতে বিছানার চাদর হাসপাতালের অপারেশান থিয়েটারের চাদর করে ছাড়বে ----এগুলো মানুষের পর্যায় পড়ে ? অ্যান্ড নাও

অ্যাবাভ অল , হি হ্যাজ্ ফাকড্ হিজ সিস্----সিস্টার ইন ল !

যে যাই বলুক ও নিজের বরকে খুবই ভালোবাসে । চিত্রর মুখটা অবশ্যই একটু পোড়া রংয়ের । ওকে ওর ভাইদের ঠিক হনুমানের মতন লাগে । ভাইরা খুব ফর্সা তো । সাহেব পাপা অবশ্য কোনো মন্তব্য করেন না ।

দাম্পত্য যাতনা এখন অসহ্য হওয়ায় ও পাল্টা চাল দিচ্ছে । ভ্যালেন্টাইন্স্ ডে -তে ও রাস্তার মোড়ের মাথায় চাপা স্কার্ট আর বুক খোলা , ক্লিভেজ বার করা টপ্ পরে সবাইকে ফ্রি হাগ দেয় । ফ্রি হাগ , ফ্রি কিস্ । বুকে, জামার ওপরে সেলাই করে এনেছে ---ফ্রি হাগ ফ্রি কিস্ --মিসেস্ কিস্ , ডোন্ট মিস্ ।

ভেতো বাঙালী ও কিছু কিছু অবাঙালী ছেলে ও বেশ কিছু বয়স্ক মানুষ ফ্রি হাগ ও কিস্ নিতে আসে ।

চিত্ররূপ তো কথা বলেনা । কুমকুম একবার বলেছিলো : মোড়ের মাথায় দাঁড়িয়ে এই বাড়ির বৌ তুই এসব কী করছিস্ ?

ভ্রূ পল্লবে বিজুরি হেনে , চোখমুখ বেঁকিয়ে ,কটাক্ষ করে -- কেন এই বাড়িই তো আমাকে এসব শিখিয়েছে । এখানে ফ্রি সেক্স । কাউকে ভালোবাসো আর অন্য কাউকে বিয়ে করো । তারপর দুজনকেই খেলাও । আমি সেটাই একটু অকাতরে বাইরে বিলাচ্ছি , প্রেমদিবসে ।

গত হোলিতে নাকি উল্টোদিকের ফ্ল্যাটের পাঞ্জাবী ছেলে গুরবক্স সিং তোমার বুবস্-এ ওর লোমশ হাত দুটো বুলিয়েছিলো ? সেটা দাদা জানেন ? কেমন লেগেছিলো পরপুরুষের আদর ? কতগুলো হল টোটাল ? আর কোন কোন জায়গায় হাত বুলিয়েছে ? কুস্তিগীরের হাত ,নরম নরম পাকা আমগুলোর কী দশা হবে তাই ভাবছি ।

কুমকুম কোনো উত্তর না দিয়ে সরে যায় । এর মুখে মুখে তর্ক করে লাভ নেই । ওকে বাগে পেলেই রতি যেন কেবল মৈথুন আর রতিক্রিয়ার গল্প শোনায় । অশ্লীল কথা , ভালগার জেস্চার যেন ওকে চেপে ধরে , কখনো মধ্যমা মানে আঙুল তুলে দেখায় তো কখনো কুৎসিত বুলি । বাইরের থেকে কেউ এলে কানে আঙুল চাপা দেবে ।

ওদের শুভাকাঙ্খীরা বলে- চিত্ররূপের উচিৎ নিজের বৌকে নিয়ে অন্যবাড়িতে আলাদা হয়ে যাওয়া ।

কিন্তু চিত্র তো এই সম্পর্ক টানতেই ইচ্ছুক নয় আর অন্য বাড়িতে যাবে কি ?

অনেকে আবার বলে : ওদের মধ্যে যদি অবৈধ সম্পর্ক থাকে তাহলে অরূপ টের পেলোনা এতদিনে ? মেয়ে তো স্কুল ফাইনাল দেবে ?

রতি ও তার বন্ধুরা বলে :দাদা খুব গোবেচারা , অন্যধরণের মানুষ । এগুলো বুঝতে পারেন না । তারই ফায়দা ওঠাচ্ছে ওরা দুজন ।

এসবের মধ্যেই একদিন হঠাৎ চিত্ররূপের একটি দূর্ঘটনা হয় । তারপর থেকে তাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছেনা । রেলগাড়ি উল্টে পড়েছিলো নদীর ধারে । চিত্র নিঁখোজ । অন্য যাত্রীদের অনেকেই নিঁখোজ, অনেক-কেই আবার পাওয়া গেছে । কাজেই অনেকে মনে করে সে মারা গেছে । কেউ কেউ এমনও ভাবে যে সাংঘাতিক পুড়ে গেছে বডি , তাই চেনা যায়নি ।

কুমকুম খুব কান্নাকাটি করে । রতি পাথর । মাসকয়েক কোনো কথা বলেনি । মা ও পাপা এসেছিলেন । ওকে নিয়ে যেতে চেয়েছেন । ও যায়নি । এখানেই কোনোরকমে আছে । বাড়িতে অরূপের সাথেই কেবল কথা হয় । কুমকুম ও তার মেয়ে তিতাস্ এর সঙ্গে ও বাক্যালাপ করেনা ।

স্বামীর সাথে বনিবনা ছিলোনা । কিন্তু হঠাৎ যে এমন জটিলতা-ধূমকেতুর মতন দেখা দেবে তা ওর স্বপ্নেরও অতীত । এখন কী করবে, কোথায় যাবে , কবে যাবে এগুলো মাঝেমাঝে মাথার মধ্যে স্পার্ক এর মতন এলেও স্থায়ী হয়না । এরাও কোথাও চলে যেতে বলেনা ।

কাজেই ও এখানেই আপাততঃ আছে । বন্ধুরা বলে : সোনোগ্রাফার হিসেবে এখানে কাজ করতে । বিদেশের শিক্ষা ওর । ভালো হাসপাতালে কাজ পেয়ে যাবে । মাইনেও অনেক

হবে । এমনিতে চিত্রর ,ও লাইফ ইন্সুরেন্স পেয়েছে । তা অনেক টাকা । আর কোম্পানিও দিয়েছে বেশ অনেক টাকা , ক্ষতিপূরণ হিসেবে । কারণ সে ওদের কাজেই গিয়েছিলো ।

একা মানুষ হিসেবে কাজ না করলেও ওর চলবে । কিন্তু সৎ ভাইরা ইমেলে পরামর্শ দিয়েছে : তুমি লাকি যে ল্যাঙ্গুর ভ্যানিশ । এবার এখানে চলে এসো । দেখো যে সিভিলাইজড্ পার্টনার পেলে লাইফ কেমন বদলে যায় । অ্যান্ড দিস্ টাইম হি উড্ নট্ বি আ সিস্টার ফাকার । ফর সিওর।

মনের দু:খ মনেই চেপে এখানে আছে রতি । দিন কেটে যাচ্ছে ।

মাঝে মাঝে ও নাটক দেখতে যায় । সমস্ত নেগেটিভ নাটকগুলো দেখে । আয়নায় নিজেকে দেখে । নিজের জীবন নিয়ে নাটক লেখার কথা ভাবে ।

ও তো জ্ঞানত: কারো কোনো ক্ষতি করেনি । তাহলে ওর জীবনেই এরকম কেন হল ? বাবাকে খুব ভালোবাসতো । বাবা মারা গেলেন ।

আর স্বামীও যেন আপন নয় ,পর । ওর শত্রু । শেষে সেও হারিয়ে গেলো । হয়ত মৃত বা নিঁখোজ । কিইবা গেলো এলো ।

বাড়িতে থাকলে তাও চোখের দেখা দেখতো । এখন তাও হয়না । ফারাক আর বিশেষ কিছু নেই ।

একসময় ও কুমকুমকে হুমকি ইমেল পাঠাতো, ছদ্মনামে -- তোমাকে মারার জন্যে গুন্ডা আসছে । যেই অফিস থেকে বার হবে তোমাকে ফালাফালা করে দেবে । যারা অন্যের শান্তি নষ্ট করে তাদের এই পরিণতিই হয় ।

---তুমি আজকে যখন বাড়ি ফিরবে তখন গুন্ডারা তোমাকে গ্যাং রেপ করে দেবে ।

--তোমার সুন্দর মুখটা আরো সুন্দর করে দেবে অ্যাসিড মেরে ।

শেষদিকে -- তোকে লাথি মেরে পেট ফাটিয়ে দেবে গুন্ডারা । তোর লজ্জা করেনা অন্যের ঘর ভাঙতে ? ব্লাড সাকিং লিচ্ ?

এই গতানুগতিক জীবনে একটু পরিবর্তন এসেছে আজকাল ।

ও একটা শিস্ের আওয়াজ শুনতে পায় , নাটক দেখে ফেরার সময় অথবা যখন একা থাকে । রাস্তায় অনেকবার পেছন ঘুরে দেখেছে । কাউকে দেখতে পায়নি । ঘরেও তো কেউ থাকেনা যখন শিস্ শোনে ।

হয়ত বাইরে কেউ শিস্ দেয় । কিন্তু কেন ? নাকি ওর শোনার ভুল ?

আস্তে আস্তে ও লক্ষ্য করে যে শিস্টা যেন ওকে একটা বিশেষ কোনো দিকে নিয়ে যেতে চায় । শুধু ওর শব্দ ধরে এগিয়ে যাও । গন্তব্যে পৌঁছে যাবে । কেন এরকম হয়, কেন এমন মনে হয় জানে না ।

প্রিয় বন্ধু অমরাবতী বলে : তোর মনের ওপরে এত চাপ তাই হয়ত তোর অবচেতন মন তোকে টেনে নিয়ে যেতে চায় কোনো শান্তির খোঁজে । একবার গিয়েই দেখ না কি হয় !

ও কি যাবে ? বহুবার এই নিয়ে মনে উথাল পাতাল হয় ।

অমরাবতী বলে : চলে যা , এখানেই বা কোন সুখে আছিস্ ? গিয়ে দেখ্না , হয়ত কোনো নতুন দিগন্তের হদিস্ পাবি । দরজা একটা বন্ধ হলে ইউনিভার্স অন্য দরজা খুলে দেয় । দেখনা , ক্ষতি নেই তো কিছু ।

আজকাল রতি সত্যি সত্যি ভাবে, শিস্ এর দেখানো পথে যাবে । দেখাই যাক না ! কি হয় । আর ভয়ার্ত মুখ নয় , মুখে রোমাঞ্চের রং , সহসা । মাথায় অজস্র কল্পনার আঁকাবাঁকা রেখাচিত্র । মিঠে বাতাসে রোদপোহাচ্ছে ।

কুমকুম ওর কোম্পানির কাজে একটি শহরে এসেছিলো । ঠিক শহর নয় বলা ভালো রাজ্য । এখানে মানুষজন পাথরের কাজ করে । স্থানীয় সব পাথর কিন্তু চমৎকার রং তাদের । লোকে বলে : সেমি প্রেশাস্ স্টোন ।

লাল পাথরের নাম সানা , নীল পাথর নিলি, সবুজ পাথর হোরি , বেগুনি পাথর বুধিয়া , কমলা পাথর পাথুরু ,হলুদ পাথর শিবি , সাদা পাথর মরালি আর কালো পাথর হল কালিঘাটা ।

এছাড়া নক্সা করা পাথর আছে । ন্যাচেরাল নক্সা । রংগুলি এত সুন্দর যে বলার নয় । দেখতে হয় । এই পাথরগুলি সব এই রাজ্যের মধ্যে খালি পাওয়া যায় । সুন্দর সুন্দর গয়না যেমন হয় সেরকম এইসব পাথরের নানান হিলিং এফেক্ট আছে । কেউ শান্তি দেয়, কেউ শক্তি , কেউ মাথা ঠান্ডা করে তো কেউ পিত্ত কমায় । কাজেই এইসব পাথরের একটি বিরাট শিল্প এখানে গড়ে উঠেছে । এদের এখানে নানা পেস্ট এর উৎপাত হয় । সেগুলি কন্ট্রোল করার জন্যে কুমকুম এখানে এসেছে । জায়গাটা খুবই সুন্দর । নয়নাভিরাম । পাহাড়গুলি তো লাল , নীল, সবুজ, হলুদ পাথরের । এছাড়াও মরালী নদীর জল ময়ূর রং এর । বিশেষ করে গোধূলি ও ঊষায় অপরূপা , উদাসী উদাসী লাগে । অপার্থিব আলো যেন নেমে আসে লোহা লক্করের কারখানার কাছে । যেখানে পাথরে অলঙ্করণ করে মণিকারেরা । ঠিক মরালী নদীর পাড়টায় ।

এমন সুন্দর একটি জায়গায় যদি মনের মানুষ থাকে তখন কেমন লাগে ?

অসম্ভব ভালোলাগে । কেবল মনের মানুষের স্মৃতিশক্তি হারিয়ে যাওয়ায় তখন নিজেকে অসহায় ও দূর্ভাগা মনে হয় ।

দূরের পেস্তা পাহাড়ে যখন রং লাগে তখন হাতের যন্ত্র পাশে সরিয়ে রেখে, ক্ষুদ্র কুটিরের ছায়ায় ফিরে যায় কুড়িয়ে পাওয়া মণিকার দামান ।

আর মরালী নদীর কিনারায় , মরালগ্রীবা বেঁকিয়ে সার দিয়ে চলে ভ্রমর কালো আদিবাসী মেয়েরা । মাথায় বুনো ফুল । কেমন গন্ধলেবুর মতন সুবাস আসে ঐ ফুল থেকে ।

রেল দূর্ঘটনায় ,দামানকে কুড়িয়ে পায় এখানকার মানুষ । একদল মানুষ রেলে করে যাচ্ছিলো বাণিজ্যে । তখন অর্ধ পোড়া এই লোকটিকে নিয়ে আসে সঙ্গে করে । এর নামই দামান । ওরা দিয়েছে । আসল নাম কী কেউ জানেনা ।

চেনা মানুষকে- বিশেষ করে কাছের মানুষকে চিনতে মানুষের অসুবিধে হয়না । তাও আবার কোনো একসময় সে যদি হয়ে থাকে তার প্রেমিক ।

মানুষ আসলে কুকুরের মতনই ,অন্য মানুষকে গন্ধ দিয়ে চিনতে পারে । সবার গন্ধ আছে । লাল , নীল, সবুজ, বেগুনি ---এই পাহাড়গুলির মতন । সেই গন্ধ শতবার পুড়লেও হারায় না । আতরের মতন লেগে থাকে আলতো করে দেহের প্রতিটি কণিকায় ।

কুমকুম বুঝতে যে পারে চিত্ররূপ বেঁচে আছে । হয়ত স্মৃতি হারিয়ে শান্তিতে আছে । কি লাভ ওর ভাঙন- জোড়া লাগিয়ে ? কাঁচ ভেঙে গেলে রসায়ন দিয়ে জোড়া হয়ত যায় কিন্তু মসৃণতা হারিয়ে যায় । অহেতুক ঝনঝন শব্দ হয় । কাজেই কুমকুম এই সত্য গোপন করেই দিন কাটাতে থাকে । অরূপকেও জানায় না । চিত্ররূপ জীবিত আজ এটাই সত্য।

আর চিত্র তো কাউকেই আর চিন্‌তে পারেনা । কাজে কাজেই--- মেঘছায়ায় স্নান করে, বধূ- সুন্দরী কুমকুম ,মধ্যদিনের গানে নিজেকে ডুবিয়ে দেয় ।

✳

যশোমতী

শেষপর্যন্ত শিস্‌ের শব্দ, অনুরণনেরই জয় হল । রতি সেই শব্দরেখা ধরে এগিয়ে চললো । কাউকে দেখা যায়না । শিস্‌টা পেছন থেকে আসে ।

কখনো প্রিয় কোনো গানের সুর বাজে-- শিসে শিসে ।

শব্দভেদী বাণের মতন রতি ধাওয়া করে শিস্‌ পথে ।

প্রথমবার কিছু দেখা যায়না কিন্তু অনেকটা পথ সে চলে এসেছে উত্তর দিক ধরে । দ্বিতীয় দিনেও এইভাবে আরো কিছুটা । এরকম করে করে অনেকটা পথ চলে যায় ।

বাড়ি ফিরে অমরাবতীকে মোবাইলে কল করে বলে শিস্‌ পথের কথা । শিস্‌ মানুষ অবশ্যই অদেখা আছে এখনও অবধি ।

অমরাবতী বলে : ধাওয়া করে যা । কোন কোন গানের সুর শুনেছিস ?

রতি হেসে ওঠে , বলে --সিসা হো ইয়া দিল হো, আখির টুট্‌ যা তা হ্যায় !

--ধাগে তোড় লাও চাঁদনি সে নূর কে ! ঘুংঘট্ হি বানালো রশ্নি সে নূর কে--!

-----আর --- জানে কিত্নে দিনো কে বাদ গলি মে আজ চাঁদ নিকলা !

--------সবকটাই তো তোর প্রিয় খুবই প্রিয় গান । শিস্ওয়ালা বা ওয়ালি তোকে খুব বোঝে আর জানে । তাই না --- হেসে বলে অমরাবতী ।

--হ্যাঁ , মৃদুস্বরে বলে রতি, কিন্তু লোকটা বা অস্তিত্বটা কার বলতো ?

--কেউ তো আছেই ! আমি কিন্তু কোনোদিন শুনতে পাইনি । হয়ত খেয়াল করিনি । তবে আমি তোকে বিশ্বাস করি । ক্রেজি মনে করিনা ।

-- আমার সৌভাগ্য । হ্যাঁ , তাই হবে কোথাও আছে , যাইহোক এই শিস্ পথে চলে দেখি কোথায় গিয়ে পৌঁছাই । তবে আশেপাশে চোখ রাখছি যদি দেখা পাই ।

ফোন রেখে দিলো রতি ।

শিস্-পথে চলা নেশায় দাঁড়িয়ে গেছে । রোজ সকালে মর্নিং ওয়াকের মতন ও শিসের শব্দ ধরে হাঁটে । এমন সমস্ত পথে চলে যা কখনো দেখেনি আগে ।

এই এলাকায় তো আছে অনেক বছর কিন্তু এইসব সবুজ ধানের ক্ষেত , সুর্যমুখী ফুলের ক্ষেত , বড় বড় উইন্ডমিল , লালমাটির ভেজা ভেজা মাটির সুগন্ধ মাখা পথ অথবা সরু পাকদন্ডী , নীলাভ সর্পিল জলরেখা , মাটির দোতলা পরিস্কার দালান, ধানের বড় বড় স্বর্ণাভ গোলা সে আগে কখনও দেখেনি । কলকাতা হৈ-হুল্লোড়ের শহর । ইট্ কাঠ কংক্রীটের শহর । কিন্তু তারই পাশে সমান্তরালভাবে রয়েছে শিস্পথের এই অপরূপ নগরী । রৌদ্রছায়ার নগর । বুকের ভেতরে অজানা উথালপাতাল । ভালোলাগার , ছন্দের , নেশার ।

হঠাৎ দেখে একদল যাযাবর ধরণের মানুষ চলেছে উটে চড়ে । খাস্ কলকাতার পাশে । বিশাল লাইন গাড়ির । গাড়িগুলো যেন লম্বা লম্বা ট্রামের মতন । সামনে ও পেছনে বেশ কিছু উট চলেছে । মোট জনা ত্রিশ মানুষ ও দু চারটি বাচ্চা রয়েছে দলে । প্রথমে রতি ভাবলো এরা সবাই ভবঘুরে । একটু এগিয়ে

গেলো । একজন একটু হাসিহাসি মুখে তাকালো । রতি হাত তুললো : হাই !

ভেবেছিলো গ্রাম্য এরা সবাই --তবুও রতি অভ্যাসবশতঃ হাই বলে ওঠে ।

উল্টোদিক থেকে ভেসে এলো প্রতিধ্বনি : হাই , হাউ আর ইউ টুডে ?

পরিষ্কার ইংরেজি । একটু ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেলেও রতি সেটা ঢেকে রাখতে পারলো । এগিয়ে গেলো রং চং-এ , ঝলমলে দলটির কাছে ।

যেই মেয়েটি উত্তর দিয়েছিলো নাম তার যশোমতী ।

দলটি এইভাবে বেশ কয়েকবছর হল ঘুরছে , এক অখ্যাত নগর থেকে বেরিয়ে । ওদের দলের পান্ডা যশোমতীর বর । তার নাম কর্ণেশ । চিত্রেশ আর তার বৌ সবরমতীও আছে । কর্ণেশ ও চিত্রেশ কিন্তু ভাই নয় । যশোমতী আর সবরমতী যমজ বোন । আরো মানুষ আছে সঙ্গে । ছেলেপুলে আছে কটা ।

সবার পোশাক খুব উজ্জ্বল । গয়না পরেছে পুঁথির , সেগুলো খুব উজ্জ্বল রং এর । ছেলেরাও কানে দুল, হাতে মোটা বালা পরা ।

এরা সবাই কিন্তু শিক্ষিত মানুষ । জীবনপথে পাড়ি জমিয়েছে একঘেয়ে শহুরে জীবন থেকে মুক্তি পেতে । জীবন নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করতে বেরিয়েছে ।

বলে যশোমতী : কেউ কেউ পদচিহ্ন রেখে যায় । অন্যরা সেই পথে চলে । তাদের হাত ধরে এগোয় সভ্যতা । কল্পনা আর সাহস এই দুটোর হাত ধরেই এগিয়ে চলে মানুষ । সমস্ত বড় বড় সৃষ্টি বা গবেষণার উৎস কল্পনা । তার তত্ত্বকে সত্য সাপোর্ট করলে তাকে বলা হয় বিজ্ঞান ।

চাঁদে যদি কেউ না যেতো তাহলে কি আজ মঙ্গলে যাবার কথা ভাবা হত ?

যখন মানুষ প্রথম ওখানে যাবার কথা বলেছিলো কিছু কিছু মধ্যমেধা তখন খুব বড় বড় লেকচার দিয়েছিলো : এরকম আবার হয় নাকি ? যদি এমন হত তাহলে ভালো হত । এখন তাদেরই কোনো বংশধর এসে গলা ফাটায় : মানুষ এত এগিয়ে গেছে , মঙ্গলে যাচ্ছে , উইরেনাসে যাচ্ছে ।

পদচিহ্ন সবাই আঁকতে পারেনা । তার জন্য সাহস, বুদ্ধি ও কল্পনা লাগে । আউট অফ দা বক্স চিন্তা চাই । আমাদের মতন হয়ত একদিন অনেকেই এই পথে আসবে । একেঘেঁয়েমি কাটাতে । আজ আমাদের নিয়ে খুব হাসছে । পাগল , উন্মাদ বলছে । আসলে মানুষ সুযোগ সন্ধানী । যখন দেখে বেশ অনেক লাভ হচ্ছে এটা থেকে তখন সেই জিনিস গুরুত্ব পায় ।

আমরা ঘর ছেড়েছি কেন জানো ?

দাবানলে বছরের পর বছর সম্পত্তি নষ্ট হয়ে যেতো । সমস্ত পুড়ে যেতো । মায়ায় পড়ে ঐ জায়গা ছেড়ে যেতে পারিনি । বার বার এরকম হত । শেষে গেলাম অন্য জায়গায় । ঘর বাঁধলাম । সেখানে অন্য উৎপাত ।

বছর বছর বন্যার কবলে পড়তাম । এইভাবে তিননম্বর বার গেলাম সমুদ্র উপকূলে । সেখানে সামুদ্রিক ভয়ানক ঝড়ের কবলে পড়ে সর্বস্ব খোয়ালাম । শেষকালে সবাই মিলে পথে বার হলাম ।

ঘটিবাটি, লোটা-কম্বল সবই সাথে আছে । আমাদের জীবন খুব রোমান্টিক । রোমাঞ্চের । বনবাদারের কাছে গেলে আমরা শিকার করে খাই । পাখি মারি, হরিণ মারি , শূকরের মাংস খাই । নদীর কাছে মাছ ধরে খাই ।

একদম টাট্‌কা সেইসব মাছ । সমুদ্রে মাছ ধরার ও সাঁতারের অভিজ্ঞতা আছে । সঙ্গে জেলে ডিঙিও রয়েছে । গাড়ির মধ্যে । ওগুলো নিয়ে কিছুকাল সমুদ্রে মাছ ধরে আসি । এইভাবেই কয়েক বছর কেটে গেছে । কখনো কখনো কোনো না কোনো সভ্যতায় গিয়ে কাজ নিই । যেমন ফসল তোলা কিংবা মালবহন । স্বাস্থ্য ভালো থাকে , কিছু রোজগারও হয় । কোনো কাজই ছোট নয় । কাজ মানেই পবিত্র । অবশ্যই সৎ পথে কাজের কথা বলছি ।

অনেক শান্তিতে আছি জানো । ঘর পোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখলে ডরায় । আমাদেরও সেই অবস্থা । তাই আমরা পথেই ভালো আছি । সবাই মিলেমিশে আছি ।আছি মিলেমিশে --- বলে হেসে ওঠে হা হা করে যশোমতী । সাথে আছে সুরকার আসমান্ । ও হারমোনিয়ামে সুর কম্পোজ করে , আকরিক সুর । ভেজাল সুর নয় । সেই গান আমরা চাঁদের আলোয় মাদুর পেতে বসে শুনি । খাই পেট ভরে, ইটকাঠ দিয়ে বানানো-অস্থায়ী চুল্হায় পোড়ানো শিকার করা পশুর বা পাখির মাংস । কচ্ছপের ডিম খেয়েছো কখনো ? আমরা খেয়েছি । আদিবাসী মানুষের সংগ্রহ থেকে নিয়ে ।

আসমান হারমোনিয়ামে আঙুল ছোঁয়ালেই সুর বাহার বিচ্ছুরিত হয় । তোমরা কেবল এ আর রহমান্ আর অমুক তমুকের নাম জানো । এরকম জিনিয়াসের সঙ্গলাভ করেছো কখনো যার সুর ইন্সট্যান্টলি কম্পোজড্ হয় । তুমি বিষয় দাও আসমান সাথে সাথে সুর তৈরি করে দেবে । তবে ও প্রচার বিমুখ । বলে : সঙ্গীত প্রকৃতির মাঝেই বেশি সুরেলা হয় । ইট কংক্রিটের মধ্যে ও তেমন খোলে না । ওর দম আটকে যায় । সুর হারায় সুরবাহার---- চমৎকার ।

যশোমতী নাকি ওর সন্তান জন্মের আগে খুব মদ্যপান করতো । ও তখন একটি কোম্পানিতে কাজ করতো ম্যানেজার হিসেবে । নানান স্ট্রেস কাটাতে মদ্যপান করতো । রোজ

সকালে ক্লায়েন্টের গালি খেতে হত । সন্ধ্যায় বসের চপটাঘাত ও কখনো কখনো কুপ্রস্তাব । শেষে প্রেগন্যান্ট হবার পরে অসম্ভব মদ খেতো । সিগারেটও ধরেছিলো ।

চিকিৎসক বলেন :য়্যাশ্ (Yash), তোমাকে মদ্যপান বন্ধ করতে হবে ।

কিন্তু বন্ধ করতে হবে বললেই হবেনা । তার সাবস্টিটিউট্ বলতে হবে ।

উনি বললেন : যোগা , ধ্যান স্ট্রেস কমাবার উপায় ।

যশোর ভালোলাগেনি । ঐ ফস্ফস্ করে ব্যায়াম , জিমন্যাস্টিক আর চুপ করে ঘন্টার পর ঘন্টা বসে থাকা ওর দ্বারা হবেনা । তাই কর্ণপাত করেনি । মদ আর সিগারেট খেয়ে খেয়ে প্রায় পুরো প্রেগন্যান্সি কাটায় । তার ওপরে অত ছোট একটা জায়গা দিয়ে মানুষ পাস করা --তা যতই ছোট হোক্- একটা বিদিকিচ্ছিরি ব্যাপার আর তার স্ট্রেস আলাদা -কাজেই শেষ অবধি নেশায় চুর হয়েই কাটলো বেলা ।

কোপ পড়লো বেচারি শিশুটির ওপরে । জ্যান্ত শিশু তো প্রসব করলো

কিন্তু তার আর গ্রোথ নেই । দশ বছরের বাচ্চা দেখতে এক বছরের বাচ্চার মতন । বন্ধুবান্ধব ওর সঙ্গ ত্যাগ করলো । ও একপ্রকার সমাজে ত্যাজ । ওর সন্তান ঘৃণ্য । কুৎসিত তার

অবয়ব । দেখলেই গা ঘিন ঘিন করে । নিজেদের বাচ্চাদের সাথে ওকে মিশতে দেবার প্রশ্নই নেই কারণ ওর কোনো বোধ নেই । অবোধ । মাথাটি বিশাল । হাত-পা গুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র , পক্ষীশাবকের মতন । কেমন ঘেন্না লাগে একে দেখলে । তবে আর যাইহোক বাচ্চাটা ফর্সা আছে ।

যশোমতী কেঁদে ফেলে । বলে : আমার মেয়েটি একটু ছোট আছে । কিন্তু কী করবো আমি ? আমি তো ওকে টেনে বড় করতে পারিনা আর মেরেও ফেলতে পারবো না । আমি যে ওর মা !

ক্ষমা-ঘেন্না করে তবুও কেউ ওকে কোলে নেয়নি। কিন্তু এখানে দেখো আমাদের পথের সমস্ত সাথীরা ওকে আদর করে । ওর জন্মদিনে উৎসব হয় । আসমান্ নতুন সুর বাঁধে ওকে নিয়ে । বন্য হরিণী ওকে শুঁকে যায় । ময়ুরের পেখম দিয়ে ঢেকে রাখে কোনো কোনো বনময়ূর । পাখিরা কলকাকলি করে ওর খোঁজখবর নেয় । এখন আমি খুব আনন্দে আছি জানো । মাঝেমাঝে রাতে ঘুম ভেঙে যায় । মদ্যপান ও সিগারেটের নেশার কথা মনে পড়ে । নিজেকে ক্ষমা করতে পারিনা । আবার মনে হয় : এখন এরকম ভাবছি । তখন ওরাই আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছিলো । কাজেই ওদেরও দোষ দেওয়া যায়না । তখন স্ট্রেস থেকে বাঁচতে ওদের আঁকড়ে ধরি । এখন সন্তানের বিকলাঙ্গ শরীরের কষ্ট থেকে বাঁচতে পথকে আশ্রয়

করেছি । এই তো জীবন । ভেসে চলা আর কোথাও না কোথাও নোঙর ফেলা ।

আমি আবার নখের কারুকার্য শিখেছিলাম । নানান রঙে নখ রাঙানো , নখে নক্‌শা করা , নানান আকৃতির নখ তৈরি করে রিয়েল নখে বসানো এইসব । এখন কোনো কোনো শহরে বা গ্রামে যখন আমরা কিছুদিনের জন্যে দাঁড়াই তখন আমি আমার নখদন্ত বার করি । বেশ কিছু রোজগার হয়ে যায় । মানুষের ভালোলাগে , নিজেদের সুন্দর দেখে , রঙীন নখের আবরণে নিজেকে ঢেকে । আমাদেরও ভালোলাগে কিন্তু আমি নখের স্বাস্থ্যের দিকেও নজর দিই । নখ মালিশ , কিউটিকেল সংরক্ষণ করা এগুলোতেও জোর দিই । যেন কোনোমতেই নখের ঘায়ে মানুষ জখম না হন । আজকাল দেখি বড় শহরের দিকে পুরুষেরাও আসেন নখ রাঙাতে, একজনের নখের সাইজ দেখেছি কয়েক ফুট ! ---বলে হেসে ওঠে স্বভাবসিদ্ধ হা হা স্বরে যশোমতী ।

এগিয়ে চলে ওরা --গাড়ির তালে তালে। উটের পালের গলায় বাঁধা ঘন্টার

ঝুমঝুম আওয়াজ ধরে । ট্রামের মতন গাড়িগুলোতে শোবার ব্যবস্থা করে নিয়েছে । একদম পেছনে দুটি টয়লেট । লং ডিস্ট্যান্স বাসের মতন আলাদা করে লাগানো । এছাড়া আছে তাঁবু । কোথাও কোথাও লাগে । জায়গাটি মনে ধরে গেলে ওখানে কিছুদিন থেকে যায় ।

যশোমতীরা এইভাবেই বেঁচে আছে , সভ্যতার আনাচে কানাচে -শুধু তারা মাধুর্য্যে ভরায় । এই ঐশ্বরিক দলে নেই হানাহানি । নেই খেয়োখেয়ি ।

ওরা লোভী নয় । তাই স্বল্পতেই হয়ে যায় ।

যেখানে যায় সেখানকার রান্না শিখে ফেলে চট্‌পট্‌ করে । এইভাবে কতনা কালচারেরর স্পেশাল কুইজিন যশোমতীর নখদর্পণে !

একটা খাতা আছে । চিত্রগুপ্তর খাতার মতন । সেখানে সব পাবে । সব নোট করা আছে । মনোলোভা সমস্ত খানা ।

লেবুপাতার ঘোল পুলাউ খেয়েছেন কোনোদিন ? লাল শাক দিয়ে চিংড়ি মাছ ? ন্যুডুলস্‌ এর পিঠে ? সব লেখা আছে যশোমতীর রান্নার খাতায় , হৃদয়ের কালি দিয়ে , সোনার অক্ষরে ।

পৃথিবীর আঁকাবাঁকা , অমসৃণ পথে চলতে গিয়ে দেখতে পেয়েছে যে তার অসম্পূর্ণ সন্তানকে কোলে নেবার , ভালোবাসার মানুষও এই দুনিয়াতেই রয়েছে । শুধু খুঁজে পাবার ব্যাপার । যোগাযোগের অপেক্ষা ।

রতি ওর সন্তানকে কোলে নিয়ে খুব আদর করেছে । চুমু খেয়েছে ।

মোগাম্বো থুড়ি যশোমতী খুশ্‌ হুয়া---- !!

চিত্রেশ ও কর্ণেশ এর সাথে সখ্যতা হল । দুজনে দুরকম ।

যশোর ভগিনী সবরমতী একটি বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করতো । অনেকদিন পড়িয়েছে । টিউশানি করতো না । ক্লাসে খুব ভালোভাবে পড়াতো ।

কিন্তু পরে ছেড়ে দেয় । প্রথমত: ওর এক ছাত্রী মাধ্যমিকে ৮০ শতাংশ নম্বর পেয়েও পলিটেকনিকের ফর্ম তুলতে পারেনি । কারণ তার নম্বর নাকি অনেক কম । দ্বিতীয়ত: ওদের প্রধানশিক্ষক আদেশ দেন : যারা স্কুলের শিক্ষকদের কাছে টিউশানি পড়বে তাদের বেশি নম্বর দিতে হবে । প্রশ্ন বলে দিতে হবে । তৃতীয়ত:যারা একেবারে কম নম্বর পায় তাদের ভর্তির জন্য ডোনেশান নেওয়া বা ব্যবস্থা করা । যা অনৈতিক ।

শিক্ষা ক্ষেত্রে চরম অরাজকতা দেখে দেখে ও চাকরি ছেড়ে দেয় ।

ওর মনে হয় একজন শিক্ষকের নৈতিক চরিত্র না থাকলে ছাত্রকে গড়ে তোলা যায়না । আর শিক্ষা যেন ব্যবসা হয়ে গেছে । মেধা কেনা যায় । সার্টিফিকেট , ডিগ্রী বিক্রি হয়

খোলাবাজারে । তারপর কেউ যদি মা সরস্বতীকে নগ্ন এঁকে দেয় তখন তার অবস্থা হয় শোচনীয় । প্রাণ নিয়ে টানাটানি ।

সবরমতীর আবার ড্রয়িং করার শখ আছে । যদি সবরমতী কখনো -কোনো লগ্নে- নগ্ন সরস্বতী এঁকে ফেলে ! তাই শিক্ষাক্ষেত্র থেকে বিদায় নিয়েছে । জেলের ঘানি টানার ওর ক্ষমতা নেই আর এত অর্থও নেই যে জেল পালানো কয়েদী হবে । কাজেই সাবধান হওয়াই শ্রেয় ।

যশোর বর ,কর্ণেশ কোনো কাজ করতো না । বড়লোকের ছেলে । বাবার অঢেল টাকা । জাত ব্যবসায়ী । কথায় কথায় ফ্যাক্টরি খোলে ওরা । তবে ওর বাবা ছিলেন শ্রমিকের মালিক । অর্থাৎ শ্রমিকদের মোটামুটি দেখভাল করতেন । শ্রদ্ধেয় মালিক । কিন্তু কর্ণ তো এইপথে পা দেবে না । ও মডেলিং করতে চায় । কোটি টাকা দিয়ে মডেলিং এ চান্স পায় । ওর বাবার মতে ওসব দিকে যায় রাজ্যের লাফাঙ্গা , লুচচারা । লম্পটরা । তবুও পুত্রের আবদার ।

--ওটা একটা শিট্ প্রফেশান । চোখ কুঁচকে বলে ওঠে -এক অ্যাড এজেন্সির মালিকের বৌ-য়ের সাথে আমাকে শুতে হয়েছে কয়েকবার । আমি অবশ্য খুবই এনজয় করে নিয়েছি । মালটাকে ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে রুবিক কিউবের মতন যা দিয়েছি না

! অ্যাট লিস্ট ওর কোনো এস-টি-ডি নেই । এইচ আই ভির হাত থেকে নিস্তার পাবো ।

--ওর হাবির কী সমস্যা ? জানতে চায় রতি ।

--ইরেকশান হয়না বুড়ো ব্যাটার । পয়সার জন্য বিয়ে করেছিলো ওকে কমলা জেমস্ ,গোয়ার মেয়ে ।খুব মদ খেতে পারে সে -hangover

হলে পুরুষ লাগতো । আমাকে অবশ্যই রক্ত পরীক্ষা করে তবে নিয়েছিলো । আরে মানুষের জীবনে শুধু সেক্স ,মানি অ্যান্ড পাওয়ার । আমাকে একটি পোষাক পরতে বলে যাতে আমার গোপন অঙ্গ ও অ্যাস্ খোলা বাকিটা পুরো বোরখার মতন । আদ্যপান্ত ঢাকা ড্রেস । আমি লোককে সাবধান করছি । অবৈধ সেক্স করো , রোজ করো কিন্তু কনডোম পরে করো । এই বিজ্ঞাপন ।

মডেলিং এর ভূত মাথার থেকে নেমে গেলো । তখনও বাবার ব্যবসায় নামিনি । লোককে ঠকিয়ে পয়সা কামাতাম । এক লাখ, পাঁচ লাখ, দু কোটি অবধি পেয়েছি । বিভিন্ন শর্ত লড়তাম । বাজি বলো যাকে ।

এমনই লাক দেখো কোনোদিন হারিনি । বন্ধু, শুভাকাঙখী, ফ্যাশান ইন্ডাস্ট্রি , গার্লফ্রেন্ডের বাপ সবাইকে ঠকিয়েছি ।

লোক ঠকিয়ে দুনিয়ার অন্যতম উঁচু মিনার, ডুবাইয়ের **বুর্জ খালিফায়** একটা ছোট ফ্ল্যাটও কিনি আমি । সব ঠিকই ছিলো

তবুও শেষে একদিন চম্পট দিয়ে যশোমতীকে বিয়ে করি । ও আমার সততায় মজে । আরে আজকাল কে ধর্মপুত্তুর ? ঐ ক্যাবলাটা ছিলো না মহাভারতে, যে বৌকে অবধি পাশায় হারে ? কী যেন নাম ঐ ডিউড এর ? আমি ওর মতন না ।

দেখো ভাই, আমি অনেস্ট না । আমি যে দু:শাসন সেটা আমি গলা বাজিয়ে বলেছি । তাই সবরমতীর দিদির (যশো কয়েক মুহুর্তের বড় মাত্র) মতন পাগলিনী মানে সৎ মেয়ে আমার কন্ঠে মাল্যদান করেছে , বলেই হেসে ওঠে । বড় দিলখোলা সেই হাসি । ভুলিয়ে দেয় সব বেদনা ।

আবার বলে কর্ণেশ, একটু থেমে-----একদিন মনে হল এবার জীবনটাকে নিয়ে সিরিয়াস কিছু করা দরকার । ভাবা দরকার । তাই এখন আমি ভাই কুলিগিরি করে খাই । এই দলে ভিড়েছি । এদের মালবওয়া , উটের পরিচর্যা করা আর গাড়ি সারানো আমার এরিয়া । বদলে ফ্রিতে খেতে দেয় এরা আর মাইনে হিসেবে পাই --প্রগাঢ় প্রশান্তি । আমি খুব ভালো আছি । আমাকে এরা রেস্পেক্ট দিয়ে নাম দিয়েছে চিফ্ । দলের পান্ডা আর কি ! তবে ভগবান পুরো জিনিস । আমাকে এমন ঠকিয়েছেন শর্তে, যে সারাজীবন বোঝা বইতে হবে । আমার মেয়েকে দেখেছো তো ?

এখন হিল্লোলের বদলে মরসুমি মেঘ । চোখের কোণায় অশ্রুনদী । অশেষ ঢেউ এসে লাগে বুকের পাঁজরে । রতি স্তব্ধ হয়ে যায় । স্তব্ধ বুঝি কক্‌লিয়া ।

কর্ণেশ হাউ হাউ করে কাঁদছে । বিষণ্নতার বারি ঝরে পড়ছে ।সৃষ্টি হচ্ছে যমুনা নদীর । তার জলরেখায় কদর্য এক অম্লভাব ।

অন্যজন ,অর্থাৎ চিত্রেশের মা ছিলেন দেবদাসী । নাম ছিলো দেবকলি । বহু বছর হল এইসব প্রথা উঠে গেছে আইনত: কিন্তু এখনও অনেক জায়গায় এগুলি মানা হয় । এক বহু পুরাতন বিষ্ণু মন্দিরে উনি জন্মান । ওঁর মাও ছিলেন দেবদাসী । এলাকার এক মাতব্বরের ঔরসে চিত্রেশের মা জন্মান ।

স্বাধীনচেতা মেয়েটি, কৈশোর থেকেই স্থির করে যে মেয়েদের ওপরে এই বর্বরতা সে বরদাস্ত করবে না । এখন লড়ি ড্রাইভার , চুনোপুঁটি বস্তমিজ্ ধনী ও কিছু পাতি অ্যান্টি সোসাল-এদের কাছে আসে ।

বলে --- পাথর আনন্দ দিতে পারে না । তাই আমাদের পাঠিয়েছে ভগবান । তোমাদের আনন্দ দেবার জন্য ।

বিশেষ করে শিবলিঙ্গ ও দেবতা জগন্নাথের কথা বলে । বলে -- ওর দেখো তো হাত নেই । ইচ্ছে হলেও সম্ভব নয় । তাই আমরাই তোমাদের বাঁচিয়ে রাখি । এগুলো তো খারাপ কিছু নয় , মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি । জানো না ভগবানই তো স্রষ্টা । আর পঞ্চভূতের ফাঁদে , ব্রহ্ম পড়ে কাঁদে ।

এইসব কথায় ভোলবার মানুষ নন চিত্রেশের মা নলিনী । সংগ্রাম করলেন । একদিন পালালেন রূপসী নলিনী । মায়ের, যুবক তবলা মাস্টারের সাথে । কন্যার থেকে পাত্র অনেক বড় ।

চিত্রেশের জন্মের পরে ওর মা মারা যান । বাবা ওকে মানুষ করেন । কিন্তু তিনিও বেশিদিন বাঁচেন নি । ও পরে , নিজের দিদিমার সাথে দেখা করতে ঐ মন্দিরে যায় । ওকে লোকে **মার তবলা** বলে ক্ষ্যাপাতে শুরু করে ।

আদতে ,বাপের বয়সী মায়ের তবলাবাদকের সাথে পালিয়েছিলো যে নলিনী , তারই সন্তান ও --নাম যদিও চিত্রেশ তবু সে এখন কেবলই **মার তবলা** ।

---আমার মায়ের প্রিয় মুভি ছিলো গুলজারের -মৌসম । আর আমার প্রিয় মুভি সেই গুলজারেরই -লেকিন । দুটি জেনেরেশান কিন্তু একই মানুষের ভক্ত আমরা মা -ব্যাটা । মায়ের প্রিয় ডায়লগ ছিলো মৌসমের -- আচ্ছি বাচ্চি কৈ নেহি হ্যায় ইঁহা । সবকে সব রান্ডিয়া হ্যায় । লেকিন ধান্দা আচ্ছা কর লেতি হ্যায় !

সমাজের মুখে যেন একটা বিরাট থাপ্পড় !

মা নাকি বলতো : মেয়েদেরকে ছেলেরা সবজায়গাতে কোনো না কোনো ধান্দায়-ই লাগায় । সমতা বোধ দুনিয়ায় আসবে না । মেয়েরা মেয়েই থেকে যাবে আর **ধান্দা আচ্ছা** করে খাবে ।

কমিউনিজম কি পেরেছে শ্রেণী বিভাগ ঘোচাতে ? পারেনি । পারবে না ।
পাওয়ার পেলেই সিংহভাগ মানুষ তার মিস্ ইউজ করে । কাজেই অন্যভাবে আবার শ্রেণী বিভাগ , শোষণ মাথা চাড়া দেবে । শুরু হবে মোরগ লড়াই ।

তবলাবাদক বাবা কিন্তু চিত্রকে শিক্ষা দেন । ও বি-কম পাশ । অগ্রবালের গদিতে বসতো । হিসেবের খাতা নিয়ে । শেষে সবরমতীর সাথে আলাপ । ওদের স্কুলের মালিকও ঐ অগ্রবালই । ঝানু ব্যবসায়ী । প্রতিটি নুড়ি কে কী করে পাইসা করতে হয় ওর থেকে ভালো কেউ জানেনা । আর গরীবরা লাথির কাঁঠাল বলেই মনে করেন । চাকর বাকরদের মনিষ্যি জ্ঞান করেন না । উঠতে বসতে লাথা-ন । লাথি ও লাঠি এইদুটিই তার অস্ত্র ।

এক কমিউনিস্টের আবির্ভাব হয়েছিলো সুযোগ বুঝে । কিছুদিন --**শোষক শ্রেণীর কালো হাত গুঁড়িয়ে দাও** --করে টরে সেও শেষমেশ পলায়ন করে শোষকের কাছ থেকে মোটা টাকা আদায় করে । শোষককে শোষণ করে ।

---এন্ড অফ দা ডে সবাই শোষক , এই কমিউনিস্ট ব্যাটাকেই দেখো । কাকে বিশ্বাস করবে আর ? নীতি বাগীশদের নিজেদেরই কোনো মরাল নেই । কে কাকে দেখবে আর ঠিক করবে ? সবাই শোষক । যে যার নিজের মতন করে চোষে । লিচ্ থেরাপি যারা করে ,তারা দেখো শোষক জোঁককে মানুষের অসুখ সারাতে কাজে লাগায় । জোঁক রক্ত শুষে নেয় । মানুষের অসুখ পরিণত হয় সুখে । অনেকে জোঁকগুলোকে মেরে ফেলে । অনেক হিলার ওদের বাঁচিয়ে রাখে ভালোভাবে । কাজেই কে কী শুষছে আর কেন -সেটা বেশি গুরুত্বপুর্ণ ।

একনাগাড়ে কথাগুলো বলে থামলো চিত্রেশ ।

রতি দেবদাসী প্রথার কথা শুনেছে । বললো : আগে তো শুধু ঈশ্বরের জন্যে এরা নাচতো, খুব প্রেস্টিজ ছিলো এদের রাজসভায় । সমাজে । রাজা এদের খুব সম্মান দিতো । টেম্পেল ডান্সার । আজ কি দূর্দশা দেখো এদের । বংশ পরম্পরায় শোষিত হচ্ছে । লুকিয়ে ছুপিয়ে চলেছে ঈশ্বরের নামে ভোগ । প্রস্টিটিউশান ইন দা নেম গড । কিলিং ইন দা নেম অফ গড । কী না হচ্ছে ! দূর্বলদের ওপরে সবলের অত্যাচার সব যুগেই দেখা যায় ।

এদের সাথে ,এইদলের সঙ্গে -আরেকটি মানুষ আছেন । উনি ডক্টরেট । ফিশারিজে । কাজ করতেন অফিসার হিসেবে । পরে শুঁটকি মাছের ব্যবসা শুরু করেন । আসল নাম মতিলাল ফুলে । এরা নামকরণ করেছে : রূপেশ ।

রু বলে ডাকে সবাই । রু ফুলে উঠেছে ব্যবসা করে । আর এখন এই ভদ্রলোক পরিবার ছেড়ে পথে পথে । দুই মেয়ে ও স্ত্রী বহাল তবিয়তে আছে পুণাতে ।
--মারাঠী নিচু জাত তো তাই মাছ খায় ,বলে ওঠে যশোমতী ।

ব্যবসা থেকে অনেক অর্থসঞ্চয় হয় । এই শুকনো মাছ -ড্রাই ফিশ হিসেবে এক্সপোর্ট হত বিদেশে । বাংলাদেশি , শ্রীলংকার মানুষ , চীনা ফিনারা এসব খায় । ভালই আমদানি হত ।
কিন্তু মেয়েরা বেঁকে বসে - ড্যাডি , কলেজে মুখ দেখানো দায় । সবাই আমাদের স্টোন-এজের লোক বলে । বলে ,পচা মাছ খাইয়ে তোর ড্যাডি লোক মারে । তোদের গা থেকে রটেন ফিশের স্মেল আসে ।

মেয়েরা কলেজ যাওয়া বন্ধ করে । রাতারাতি, ব্যবসা বন্ধ করা যায়না । কত দরিদ্রমানুষ , জেলে ,কারখানা- কর্মীর রুটি-রুজির ব্যাপার ! তাই ব্যবসা ভালো দামে বেচে দেয় মতিলাল । লাল হয়ে যায় লাভের চাপে । সেইসব টাকা রেখে , দুজন পেল্লাই সিউকিউরিটি গার্ড রেখে পথে নামে ।

বলে : আমি বাণপ্রস্থে আছি । ঠিকানা নেই তাই চিঠি নেই । কিন্তু ইমেল ও এস এম এস করে মেয়েরা জ্বালিয়ে মারে । আমাদের এখানে এসে যোগ দেবার ইচ্ছে প্রকাশ করে ।

আমি বলে দিয়েছি -- যারা ড্রাই ফিশের বোঝা বইতে পারেনা , প্রেস্টিজে লাগে, সেই ঠুন্‌কো প্রেস্টিজ কি আর যাযাবরের অনিশ্চিত জীবনের বোঝা বইতে পারবে ? আমরা ফাইভ স্টারে থাকি না , খাই রাস্তার ধারের হোটেলে , থাকি তাঁবুতে । বর্ষা বাদল ঝড় রোদের সঙ্গে । পারবে তোমরা -মখমলের চটি আর রেশমের পোষাক ছেড়ে ,মোটা চটের নিচে দিন কাটাতে ? আমাদের দুনিয়ায় আসা আছে , ফেরা নেই । ওয়ান ওয়ে পথ । কাজে কাজেই ।

গলা পরিষ্কার করে নেয় সহ্য (চা) খেয়ে বাজি রাও মস্তানি । তারপর বলে : মতিলাল ফুলে ছোটজাত ঠিকই কিন্তু মানুষ । আগে দেখতাম মাছের চামড়া শুকিয়ে কঙ্কাল বার করা । মাছের কষ্ট হত হয়ত - আমরা গুরুত্ব দিতাম না । এখন আমি মানুষের চামড়া ছাড়িয়ে কঙ্কাল বার করা দেখি । আমার ছিলো ওটা পেশা , রুজি রোজগার । এখন যাদের দেখি তারা নেশায় করে । মানুষের মাংস খাবার নেশা । যারা মাংস খুবলে খেতে জানেনা তারা রাস্তায় ডাব বিক্রি করে , রাস্তা ঝাঁট দেয় । আর

যারা **ভালোমানুষ** জবাই করতে জানে তারাই শিবিকা চড়ে সমাজের শিখরে । **হুম্ হু নারে হুম্ হু না !**
করতে করতে পোঁছে যায় গন্তব্যে । যাদের কোলে চড়ে এলো এতদূর ,পাল্কি থেকে নেমে সবার আগে তাদের জবাই করে । কঙ্কাল বার করে তবেই শান্তি ।

--মানুষও আজকাল শুঁটকি হয় , কি ঠিক বলিনি ? পারফিউম ছড়িয়ে নেয় বলে পচা ,ঝাঁঝালো গন্ধটা চোখ এড়িয়ে যায় ।

আমাদের গল্পের নায়িকা পুণম ধীঁলোর প্রতিবিম্ব , রতি হেসে ওঠে ।

বড় অর্থপূর্ণ সেই হাসি ।

শিস্ এর শব্দ এখন তাকে নিয়ে যায় অন্যপথ ধরে অচেনা শহর নীলমঙ্গলায় । চারিদিকে জলাশয় । তার রং নীল । তাই এমন নাম । ছোট জনপদ । এখানকার মানুষের জীবিকা সবকিছুর ডুপ্লিকেট বানানো । নাইকে, লিভাইজ, সোনি ,অ্যাডিডাস্ ,রেভলন ,পিউমা ,রিবক ,আর্মানি , মার্লবরো সবকিছুর নকল এখানে পাওয়া যায় ।

শ্রমিক শ্রেণীই বেশি । মালিকপক্ষ কম । এখানে লোকে ব্যবসা আর রুপিজ ছাড়া কিছু বোঝেনা । এই দু-নম্বরীর দেশে একজন সৎ মানুষ আছেন । নাম তার শাহিন ।

*

ছাই

ভালোমানুষের পোয়ের হদিস দিলো এক লোকাল মানুষ । শাহিন এলাকার কম্পিউটার বিশারদ । কম্পিউটার ফরেন্সিকে কাজ করে । নাম আছে খুব এই ফিল্ডে । আগে এথিক্যাল হ্যাকার ছিলো । অর্থাৎ আইন অনুযায়ী নানা সংস্থার ওয়েব কার্যকলাপকে হ্যাকিং প্রুফ করতো । পরামর্শ দিতো । কিসে ওদের ড্যাটা , তত্ত্ব -হ্যাকিং থেকে বেঁচে বর্তে থাকবে তার জন্য নক্সা করে দিতো --সিগনেচার নক্সা ।

এখন ফরেন্সিকে গেছে । বেশ নামডাক হয়েছে । মেশিনে হাত দিলেই নাকি আপনা আপনি পার্স-ওয়ার্ড ক্র্যাক হয়ে যায় আর ট্রাবল শুটিং হতে থাকে । লোকে বলে।কোনো হ্যাকিং হলে অথবা অনলাইন অ্যাবিউজ , ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে অর্থ চুরি

গেলে চিন্তা নেই আর । সমস্ত কিছুই শাহিনের শক্ত দুটি হাতে ধরা পড়ে ।

ও অন্যের কম্পিউটার হ্যাক করে আইন সম্মত উপায়ে ।

শাহিনের চাহিদা ,এলাকার ল-এনফোর্সমেন্ট এজেন্সির কাছে আকাশচুম্বি । তাই ওর মূল্যও বেশি । ফি-জ খুব হাই । কিন্তু লোকটির মুখ বেজায় খারাপ । মানুষকে ইন্সাল্ট করা , গালি দেওয়া ওর রক্তে । তাই অনেকেই বেশ বিরক্ত । কিন্তু ওর মতন এক্সপার্ট এই এলাকায় একটিও নেই । আর দুনম্বরী বাজারে সমৃদ্ধ এই এলাকায় ভালই সাইবার ক্রাইম হয় । তাই ওকে সবার লাগে । সব ব্যবসাদার ওকে চায় ।

ইন্টেরেস্টিং

ক্যারেকটার ।

শিস্ এর তরঙ্গ-পথ ধরে পৌঁছেই গেলো রতি এই মানুষটির কাছে । অনেক শুনেছে এই কদিনে এর কথা । ভদ্রলোকের গায়ের রং সোনার মতন । একটু যেন -মেঘের ছায়া স্নাত সেই বরণ !

চোখ দুটি আশ্চর্য-রঙ এর । সমুদ্র শ্যামল । সি -গ্রীন । সি -গ্রীন আইজ্ ।

আগাগোড়া ভারতীয় এই মানুষটির অদ্ভুত ব্যবহার , ব্রিলিয়্যান্স , কটূভাষী ইমেজ ও নির্মেদ দেহের সাথে বোনাস পাওনা একজোড়া সি -গ্রীন চোখ । ফ্যান্টাস্টিক ! মেঘ না চাইতেই জল ।

কিন্তু রতিকেও গালি দিয়ে দেবেন না তো ? দিলে দেবেন । এরকম এক অদ্ভুত ভালোলোকের সাথে মোলাকাৎ তো হোক !

--আমার এক পুর্বপুরুষ এসেছিলেন ইরান থেকে । ইরানী ছিলেন তারা । পদব্রজে ভারতে আসেন । এখানে লোকাল ট্রাইবস্‌কে বিয়ে করেন । তাই আমাদের কারো কারো সি-গ্রীন চোখ । মুঘল সাম্রাজ্যের সময় সেই মানুষ আসেন এখানে । আমাদের পরিবারের কেউ কেউ স্বাধীনতা যুদ্ধে-ও অংশ নেন । আমার এক দাদু জেল খেটে , হাঁপানির টানে মারা যান ।

খুব লম্বা , শাহিন । শাহিন মৈ ঠাকুরাণ ।এস এম টি । শর্ট ফর্ম ।

--কোনো আই আই টি থেকে পাশ করিনি আমি । বাবা আমার ,মুখে আগুন নিয়ে খেলা দেখাতো । শুনেছেন এরকম পথের মানুষের কথা যারা কোনো কেমিক্যাল ছাড়াই মুখ থেকে আগুন বার করতে পারে ? আমার বংশের মানুষও পারতো । ফায়ার -ইটার বলে এদের ।

আগুনে মুখ পুড়লে চলবে না । এরা গরম কয়লা , আগুনের শিখা আর গলন্ত মোম খেয়ে নিতে পারতো । মুখে কোনো আলসার হয়নি কারো । পথের ধারে খেলা দেখাতো । পরে বাবাকে বিদেশী টিভি কোম্পানি খেলা দেখাবার সুযোগ দেয় । বাবাকে নিয়ে রিসার্চ করে । তখন বাবা আমাকে এই ফিল্ডে না দিয়ে লেখাপড়ায় দেন ।

পথের ধারে লন্ঠন নিয়ে লেখাপড়া করেছি আমি । আই আই টি তে ভর্তি হবার পয়সা ছিলনা । কম্পিউটারের ফান্ডামেন্টালস্ শিখেছি একজন বিজ্ঞানীর কাছে । উনি বাবার এই অদ্ভুত ক্ষমতা দেখে তার অনুরাগী হয়ে পড়েন । আগে- কম্পিউটার যে নিজে থেকে ক্রিয়েটিভ মিউজিক বাজাতে পারে তাই নিয়ে গবেষণা করতেন । কম্পিউটার নাকি মানুষের মতন । তার চেতনা আছে । তাকে যেমনভাবে কাজে লাগাবে সে তাই করবে । প্রভুভক্তও বটে ।
তো উনি আমাকে হাতে ধরে কোডিং থেকে সমস্ত শেখান ।
একটা ক্ষুদ্র চিপে কী করে এত ড্যাটা ধরা থাকে দেখে অবাক হতাম । যারা এগুলো করে তাদের দেখেও অবাক হতাম , এখন এগুলিই আমার রুটিরুজি ।

নাহ্ , রতিকে ভদ্রলোক এখনো পর্যন্ত কোনো গালি দেননি ।

অত্যন্ত বিনয়ী বলেই মনে হল তাকে । সবাই যাকে এত গালমন্দ করছে তার কটূভাষী স্বভাবের জন্য -রতির তাকে কেন অন্য কোনো গ্রহের বাসিন্দা বলে মনে হল কে জানে! সি-গ্রীন আইজের জন্য কি ?

ভদ্রলোক নাকি বিবাহিত । কোনো সন্তান নেই । স্ত্রী মুসলিম মেয়ে । নাম মিঠাস্ । পেশায় ইউনানি চিকিৎসক ।
ইউনানি কলেজে মেডিসিন নিয়ে পড়ান ।
দেখে মনে হল যেন একটি অনুষ্কা শর্মা বসে আছে সামনে । ভদ্রমহিলার কিন্তু নিজের রূপ নিয়ে কোনো আগ্রহ নেই । চুলটা কোনোরকমে এলো খোঁপা করা । কানে কোনো গয়না নেই । হাতে শুধু দুটি মোটা সোনালী বালা । শাড়ি পরা নেই ।
একটি লম্বা, মেরুন রং এর টিউনিকের মতন পরা । হাফ হাতা । ওপরে একটি সুতোর কাজ করা মিহি পেস্তা রং এর ওড়না জড়ানো সাইড করে । যেন একটা বড় চাদর নিয়ে একপাশ দিয়ে পেঁচিয়ে অন্যপাশে সুন্দর ভাবে বেঁধে দেওয়া হয়েছে ।
খুব অদ্ভুত পোশাক । রূপসী উদাসী । কে কেমন ভাবছে , অনুভব করছে তাতে সুনয়নার কিছু যায় আসেনা ।
ফুলের মতন এই মেয়ে । সুন্দর হয়েই খুশি । তার কাজ সৌন্দর্য্য বিলানো । তাই নিয়ে গর্ব করা বা মাথা ঘামানো নয় ।

শাহিনের সাথে কোথায় আলাপ ?

সে নাকি তার অফিসের ওয়েব সাইট প্রটেকশানের জন্যে এসেছিলো ।

তখন সদ্য ইউনানি পাশ করেছে ।
আরব, গ্রীস ও ভারতীয় মেডিসিনে সমৃদ্ধ এই চিকিৎসা ব্যবস্থা ভারতে সরকার স্বীকৃত হলেও ইদানিং ইংলিশ মেডিসিনের প্রভাবে কিঞ্চিৎ শিথিল এর বন্ধন ;মানব সমাজে ।
--রুরাল এরিয়ায় লোকের অত পয়সা থাকেনা যে টাকা দিয়ে বিষ কিনবে , তাই ওরা এগুলো কেনে । আমরা ইমিউন সিস্টেমকে বুস্ট করার পন্থা দিয়ে দিই । রোগ নিজে থেকে সেরে যায় । মর্ডান মেডিসিন একে বলে : ইমিউনো থেরাপি । গালভরা নাম নাহলে অনেকে কেনে না । তাই নিমপাতা কেউ খাবেনা । বিদেশ থেকে পেটেন্ট হয়ে নিমানিমা-নিমনিম নামে সেজে এলে লোকে হামড়ে পড়ে কিনবে । এটাই আমাদের স্বভাব । আর স্বভাব বদলানো সব থেকে কঠিন ।

রূপসী, ইউনানি ডাক্তারনি অনেক মোটা মোটা বই লিখেছে । এইসব বিষয় নিয়ে । আগে নাকি অনেক চিকিৎসক মধুমেহ রুগীদের মুত্র চেখে দেখতেন । মিষ্টি স্বাদ বোঝার জন্য । এমনই তাদের ডেডিকেশান ছিলো । এখনকার ডায়বেটিজের ডাক্তার এমন করবে ? অনেক চিকিৎসক তো আজকাল রুগীর গায়ে হাত দিতেও ভয় পায় , ইনফেকশানের ভয়ে ।

সন্তানহীনা এই নারীর নিজ চিকিৎসার সময় নেই । চারপাশে অসংখ্য ছাত্রছাত্রী ও রুগীকূল নিয়েই ব্যস্ত । আর ত্রস্ত মেয়েদের ওপরে অত্যাচার নিয়ে ।

--আমার মেয়ে পেশেন্টদের থেকে আমি কম ফিস্ নিই । কারো কন্যা সন্তান হলে আমি ওদের বাড়িতে ডেকে ভোজ দিই । আমাদের গার্ল চাইল্ড এনকারেজ করতে হবে ।

মনে রাখতে হবে বলশালী , বুদ্ধিমান পুরুষের শুরু একজন নারী থেকে । টেস্টটিউব হলেও অর্ধেক অংশ নারীর গর্ভ থেকে সঞ্চয় করা । আমি কাউকে মেয়ে পুরুষ হিসেবে না দেখলেও সমাজ দেখে তাই এরকম করি চিকিৎসা ক্ষেত্রে ।

রূপবতী মিঠাস্-এর কন্ঠস্বর কোকিলের মতন নয় , সুমিষ্ঠ পায়েলের মতন । রুমঝুম করে বাজে । রিনরিন করে সমস্ত চেতনায় । কথায় তার সুর আছে , আছে ছন্দ । মিঠাস্ তাই সুছন্দা । ছন্দবাণীর এক অপরূপ মিলন ক্ষেত্র ।

পতিদেব কটুভাষী বলে নিন্দিত । মিঠাস্ এর মিঠি মিঠি বাত্ সেই দোষমুক্ত হয়ত তাই অনেকটা ফাঁক বুজিয়ে দেয় । একই ছাদের নিচে থেকেও এত পার্থক্য একমাত্র ভালোবাসাতেই সম্ভব । প্রেম বাঁচিয়ে রেখেছে সভ্যতা । প্রেম আঁঠায় জড়িয়েছে মানুষ । মানব সভ্যতা । তাই বুঝি সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুর দুই

মানুষ ঘর বেঁধেছে । বাঁধতে পেরেছে । এরা একে ওপরের পরিপূরক । কমপ্লিমেন্টারি ।
চুম্বকের মতন । পজিটিভ -নেগেটিভ । একে ওপরকে প্রবল শক্তিতে টানে ।

বিজ্ঞান, হাজার ফিজিক্সের -ল ও নীতির কথা বললেও রতির মনে হয় ওখানে আছে আসলে প্রেম আঁঠা । তাই প্রায় অবিচ্ছেদ্য এই পারস্পরিক আকর্ষণ ।

মিঠাস্ নিজ স্বামীর হয়ে গলা ফাটায় : ও কিন্তু এরকম ছিলো না জানো । ও খুব নরম সরম মানুষ । সমাজ ওকে এরকম করেছে । সে এক লম্বা গল্প ।

মানুষটি নারকোলের মতন । বাইরে টা শক্ত । অন্দরে শাঁস । ভেজাল মুক্ত । বুঝেছে রতিও যে শাহিন মৈ ঠাকুরাণ এক অতি বিনয়ী, নম্র ভদ্র মানুষ । গালাগালি ওর ইন সিকিউরিটি । বা মুখোশ । কিন্তু কেন ?

রতির নিজের জীবনই তো একদম অন্যখাতে বইতে শুরু করলো বিয়ের পরে । নিছক সন্দেহ নয়, এই ঘটনা একেবারে সত্য । জায়ের সাথে স্বামীর সম্পর্ক --অবৈধ । ভাসুর ভালোমানুষ তাই টের পাননা । এক অদ্ভুত টানাপোড়েন চলেছে ।

আজকাল নাকি ওর ভাসুরের মেয়ে আন্তর্জালের মাধ্যমে এক বন্ধু পাতিয়েছে । সে বিদেশে থাকে । ভুটিয়া ছেলে একটি । বিদেশে মালির কাজ করে । বাগিচা সাফসুতরো করা ইত্যাদি । ওর বোন সনম --ভাসুরের মেয়ে তিতাসের নাকি বান্ধবী , নেট-ফ্রেন্ড । সে ওদের বাড়িতে এসে উঠেছে । কলকাতায় টেলারিং শিখছে । ওদের বাড়িতেই আছে । মেয়েটি খুব ভদ্র সভ্য । কাজ পেলেই চলে যাবে ।

কিন্তু ওর ভাই ,যার সুত্র ধরে এই বাড়িতে ও ঢুকেছে সেই ভুটিয়া ছেলে দবী দর্জি কেই নাকি বিয়ে করবে তিতাস । তাও স্কুল পাশ করেই । ওরা বিদেশে লিভ টু গেদার করবে । তিতাস ওর কাছে চলে যাবে । ও তো মালির কাজ করে ভালই কামায় । তিতাস কোনো কোর্সে ঢুকে যাবে ওখানে । প্ল্যান হয়ে গেছে । বাধা দিচ্ছে ওর বাবা অরূপ ও মা কুমকুম ।
সবই শুনেছে রতি ওর বান্ধবী অমরাবতীর কাছে ।

--- কিশোরীদের অতিরিক্ত স্বাধীনতা ও পকেটমানি দিলে এরকমই হবে । লেটেস্ট মোবাইল , ব্র্যান্ড নিউ ল্যাপটপ মুখ থেকে টু শব্দ বার করলেই চলে আসবে । এক্সট্রা পকেট মানি , ক্রেডিট কার্ড ।

ওরাও স্বাধীন হতে চাইছে সমস্ত জীবন ক্ষেত্রে । সেক্স , ম্যারেজ , মানি আর কোনো কোনো ক্ষেত্রে ক্রাইম ।

ফোনে একনাগাড়ে কথাগুলি বলে হেসে ওঠে অমরাবতী ।

সুগন্ধী তেলের কোম্পানিতে কাজ করে । মাথায় লম্বা ঘন কালো চুল । প্রায় পায়ের পাতা অবধি । সেই চুলে কাঠগোলাপ লাগিয়ে , এলো খোঁপা বেঁধে অফিসে যায় । কলিগের স্বামী , কলিগ ও অমরাবতী একসাথে ওদের বেডরুমে শুয়ে থাকে শনিবার । গল্প করে । আড্ডা দেয় । অন্য কারো বেডরুমে ,তার স্বামীর সাথে শুয়ে থাকা খুবই উদ্ভট ব্যাপার রতির কাছে ।

অমরাবতী বলে : ওদের ম্যারেজটা ওপেন ম্যারেজ । ওরা অনেক বন্ধু -বান্ধবীর সাথেই সহবাস করে । কিন্তু আমি কেবলই আড্ডা দিই । কোনো সুবিধে নিই না ।

দিনকাল বদলে গেছে । এখন অনেক রকম জিনিসই হচ্ছে । আর মিঁয়া বিবি রাজি তো কেয়া করেগা কাজি ?

শাহিনের একটি সহোদরা আছে । নাম তার শায়েরি । সে নাকি একইসাথে দুজন পুরুষকে বিয়ে করেছে । উত্তর ভারতে এরকম হয় । হয় তিব্বতী , চীনাদের মধ্যেও । লজিক হল-- একই শিশুর একের বেশি পিতা থাকতে পারে অর্থাৎ রক্ষক । স্ত্রী একই সাথে দুই স্বামীর সাথে সহবাস করতে পারে । সাধারণত: যেসব জায়গায় লোকজন ও ন্যাচেরাল রিসোর্স কম সেইসব স্থানের লোকসমাজ এইরকম ব্যবস্থা নিয়ে থাকে ।

শাহিনের বোন , সমুদ্রনীল নয়নী -শায়েরীর একজন পতির নাম নরেশ অন্যজন সুরেশ । একই সাথে থাকে । একজন প্রাইভেট অফিসে কর্মী । অন্যজন শেয়ার মার্কেটে কাজ করে । একইসাথে চাঁদনী রাতে সহবাস করে । সাহেবরা যার নামকরণ করেছে : থ্রি-সাম্ ।

দুজনে একসাথে শায়েরির প্রেমে পড়ে । শায়েরিও কাউকেই নিরাশ করেনা । কারণ একজন খুব সাহসী অন্যজন গভীর । দুজনেরই প্রয়োজনীয়তা আছে শায়েরির ভুবনে ।

শায়েরির একটি সমস্যা আছে । যদিও ওর আঁখিজোড়া শাহিনের মতন সি -গ্রীন তবুও সে অসুস্থ । সে কালার ব্লাইন্ড । চোখজোড়া রুগ্ন ।

শাহাজাদির মতন রূপ , সবুজ-নীল নয়না , অন্যকে রঙ - জালে জড়ানো এই মেয়ে নিজে রং চিনতে ভুল করে । বেরং ওর দুনিয়া । দুই পুরুষের বাহুলগ্না এই কন্যা এক আজব সীমারেখায় আবদ্ধ ।ওর জীবনকাব্যের শায়ের ,কথাকলি মেলে ধরলেও তাতে তুলি বোলান নি, সুর দেননি । তাই বুঝি ওর জীবন মেখলা শুধুই ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট ! সাদা ও কালো । দাবার ছক । তাই রাজা ও মন্ত্রীর বসবাস একইসাথে , একই

বোর্ডে । আর রাণী একটাই । শায়েরি মেমসাহেব । শায়েরির দুই টুকরো দুজনের কাছে গচ্ছিত আছে ।

---আমার বাবা তো বীর ছিলো । মুখে আগুনের লেলিহান শিখা নিয়ে খেলতো । জ্বলন্ত কয়লা, মোম এইসব-- কিন্তু সেই একই মানুষ ভয় পেতো ঘোড়ায় চড়তে । মোটর বাইকে চড়তে । অবশ্যি বড় গাড়ি বা ট্রেন ঠিক ছিলো । এত ভয় পেতো যে গা হাত পা কাঁপতো ওগুলোর পাশে গেলেই ।

বোনেরও দেখো , নিজের চোখ রঙীন অথচ চোখের আলোয় কোনো রং নেই । মানুষের এই জীবন বৈচিত্রই হয়ত দুনিয়াকে আরো সুন্দর করে যদিও এগুলি বেশ অবাক করার মতন এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে খুব দু:খের ।

আমার বোন শায়েরি ওর নামেরই মতন । খুব উচ্ছল , প্রাণবন্ত । কিন্তু ওর কাছে হলুদ গোলাপ আর লাল গোলাপের মূল্য একই ।

ওর প্রিয় ফুল শ্বেতপদ্ম । দুই স্বামী নিয়ে ঘর হলেও সন্তান একটিই । একজনই ওকে সন্তান দিয়েছে । অন্যজন পারেনি । একটিই মেয়ে । নাম

কাশমালা । আমি ওকে কাশ বলেই ডাকি । ঐ একটাই ভাগ্নি আমার ।

ওকে আমি আই আই টি থেকেই পাশ করাবো আর খুব বড় ইঞ্জিনীয়ার বানাবো । ওর বাবাদের ও মাকে আমি বলে দিয়েছি । খুব মামু মামু করে । ঐ আমাদের সবার নয়নের মণি ।

আমার টাকাপয়সা যা আছে ঐ পাবে । হয়ত মিঠাস্ও ওর অনেক কিছুই এই মেয়েকে দেবে । ও যা চায় তাই করবে জীবনে । আমার মতন প্রতিপদে ওকে ঘৃণা আর করুণা ধাওয়া করবে না ।

রতি শিস্ এর রেখাচিত্র ধরে এগিয়ে অনেক মানুষ দেখলো । অনেকগুলি জীবন ও জীবন দর্শন । নিজের জীবনের সমস্যার কথা আর তেমন মনে হচ্ছে না । একটি ফেলড্ ম্যারেজই শেষ অঙ্ক নয় । বাইরের দুনিয়া ওকে হাত বাড়িয়ে ডাকছে । আয় আয় আয়-----জীবনের মিঠাস্ নিয়ে যা , হয়ে ওঠ দূরন্ত যশোমতী কিংবা দেবদাসী প্রথাকে বুড়ো আঙুল দেখানো দেবকলি । অথবা নিতান্তই আদুরে মেয়ে কাশমালা । ভূটানি তরুণী ,সাহসী সনম হতেও তো পারিস্ ? নিজ স্বপ্নে তুলি বোলাতে যে অচেনায় পা বাড়ায় ।

রতির দুই চোখ ডুবে যায় একটা অদ্ভুত আবেশে । ও পান্থশালার নরম বালিশে মুখ ডুবিয়ে ভেসে যায় অন্য জগতে

। যেখানে রাতপোশাক পরে ওর জন্য অপেক্ষা করে আছে অনেক অপ্সরা , পরী , কিন্নরী, যক্ষনন্দিনী ।

ও যেই পাম্থশালায় আছে তার নাম টন্‌সিল ।

এরকম উদ্ভট নাম কেন জানতে চাওয়ায় মালিক বলে ওঠে : ম্যাডাম গত ৪৫ বছর ধরে আমি ও আমার সহধর্মিনী এটা চালাচ্ছি । কাস্টমার সবাই পুরনো । টন্‌সিল শরীরে প্রবেশ করা জীবানু মারে । শরীর রোগমুক্ত থাকে । আমাদের পাম্থশালা টন্‌সিলের মতন । সমস্ত জীবানু অ্যাবসর্ভ করে নেয় । গেস্টরা ভয় পায় না । অপরিচ্ছন্নতা , পোকামাক্‌ড় , ছারপোকা কিংবা অস্বাস্থ্যের । নাম শুনেই বুঝে যাবেন যে ফাইভ স্টার নাহলেও বাড়ির মতনই পরিচ্ছন্ন আমাদের এই নিবাস ।

মালিকের যুক্তি রতিকে শুধু অবাকই করেনি একটু হাসিয়ে ফেলেছিলো --অকাট্য যুক্তি আপনার আর ইন্টেরেস্টিং-ও । তবে শুনে লোকের মনে হতে পারে আপনি আগে ডাক্তার ছিলেন ।

খুব হাসলো মালিক তারপর বললো : আমার এক ছেলে টন্‌সিলের ব্যাধিতে কৈশোরে মারা যায় । টন্‌সিল অপারেশানের সময় । তারপর থেকে আমি পাগলের মতন হয়ে যাই । টন্‌সিল কথাটা শুনলেই মাথার ভেতরে আগুন জ্বলতো

। মনে হত সবার টন্‌সিল খুলে দেখি অসুস্থতর লক্ষণ আছে না কি । তারপর তাকে সাবধান করে দেবো ।

আমার পাগলামো দেখে দেখে শেষে আমার এক বন্ধু বললো : তুই এক কাজ কর । এমন কিছু কর যাতে টন্‌সিল শব্দের সাথে একটু একটু করে তোর এক্সপোজার হয় । ধীরে ধীরে দেখবি এই উন্মাদনা কেটে যাবে ।

ও অনেক পড়াশোনা করা ছেলে তাই ওর কথার গুরুত্ব দিই । তারপর দিনরাত্রি এই শব্দটাই আমাকে ঘিরে ধরে । হয়ে ওঠে পেশা ও নেশা ।

আজ আর আমি এই শব্দটাকে ভয় পাইনা । বুঝেছি আমি ,একটা জীবন অধ্যায়ে নিজেকে বন্দী করে ফেলেছিলাম । মানুষ ইমোশানে চলে তো , তাই আমাকে ঐ সময় ঐ আবেগ কাবু করে ফেলেছিলো ।

টন্‌সিল শুনলেই আমি রিয়েলিটির বাঁধন ছেড়ে কল্পনালোকে পাড়ি দিতাম ,যেখানে শুয়ে আছে হাসপাতালের বেডে আমার মৃত কিশোর পুত্র । মাথার ভেতরে দুমদাম ইট পড়তো ।

কিছু ছবি, আওয়াজ আর গন্ধ আমাকে নিয়ে যেতো সেই মূহুর্তে যেখানে আমি বারবার হারিয়ে যেতাম । এখন দেখতে পাই ওটা আমার মনোবিকৃতি । রিয়েল ওয়ার্ল্ড অন্য নাটক দেখাচ্ছে । আমি এখন অন্য স্টেজে । এখানে টন্‌সিল এর সাথে আসে অন্য চিত্র, বর্ণ , গন্ধ ও সুর ।

জীবনটা একটু ঝাঁকিয়ে নিয়েছি মাত্র । তাই হয়ত আমি বেঁচে গেছি ।

রতিও কি ওর জীবন কলসটা একটু ঝাঁকিয়ে নেবে ? মন্দ কী ?

হারুণ নামক এক ব্যাক্তিকে ওর ভালোলাগছে । হারুণ স্ট্যালিন মাধব্নী । হারুণের সাথে এত মিল ওর ! চিত্ররূপের সাথে এত মিল ছিলোনা । কিন্তু ওকে খুব ভালোবাসতো । আজও বাসে । কিন্তু হারুণ যেন ওর জীবনে মধুবনী । মধুর কলস নিয়ে এসেছে । ওর সোলমেট ।

হারুণকে ও চিবিয়ে, গিলে, চুষে খেয়ে ফেলতে পারে ।

হারুণ শিস্ দিচ্ছে না কিন্তু । ও প্যারালালি চলেছে । ও কি শিস্ শুনতে পাচ্ছে ? জিজ্ঞেস করা হয়নি এখনও । ফিরোজ খানের মতন চেহারা ।

হারুণ অল রশিদ না সই হারুণ স্ট্যালিন মাধব্নী-ই হোক ।

নতুন বাতাস আসুক গুলমোহরে । আসুক নতুন কুঁড়ি , পেখম , বৃষ্টি , চাঁদনী । আসুক না , মন্দ কি ?

মিঠাস্ ওর বরের গল্প শোনালো । আগে নাকি শাহিন এত কটূভাষী ছিলো না । খুবই নম্র ছিলো সে । ওর বাবা ওকে লেখাপড়া করান । আগুন নিয়ে না খেলিয়ে । ও আগে একটি সাধারণ অফিসে কাজ করতো । কিন্তু ভদ্রসমাজে কাজ করতে এলে লোকে ওকে হেয় করতো । গালাগালি দিতো । অনেকে ঢিল মারতো । বেয়ারা ফাইল ছুঁড়ে দিতো ওর দিকে । যাতে ছোঁয়া না লাগে । ক্যান্টিনে ওকে খাবারের থালা পা দিয়ে ঠেলে দেওয়া হত । ওর সি -গ্রীন চোখ বলে মস্করা করতো । মায়ের চরিত্র নিয়ে খোটা দিতো । কোনো কলিগ ওর সাথে খেতো না । উঠতো না বসতো না ।

তখন শাহিন প্রতিজ্ঞা করে : আমি একদিন এত ওপরে উঠে যাবো যে এরা এসে আমার পদলেহন করবে ।

এখন সেরকম দিন এসে গেছে । লোক দেখলেই ও তাকে গালাগালি দিতে শুরু করে । এমন গালি দেয় যে লোকে ভাবে ও স্লাম থেকে এসেছে । ভদ্রসমাজে এইসব শব্দ শুনলে লোক মুখ ঘুরিয়ে চলে যায় । কিন্তু পরিস্থিতির কারণে ও এখন পাহাড়ের চূড়ায় । মুকুটের মতন উজ্জ্বল । সবার চোখে পড়ে । এভারেস্ট থেকে তো কত বরফ কণা ঝরে পড়ে পর্বতারোহীর গায়ে । তাতে কি কেউ কিছু মনে করে না এভারেস্টকে ত্যাগ করে ? আসুক বরফ , বিজলী , বরখা

থুড়ি বর্ষা তবুও এভারেস্ট তো যুগ যুগ ধরে মানব সভ্যতাকে ডাকে । সেই ডাককে কেউ উপেক্ষা করতে পেরেছে ?

শাহিন কিরীট না কিরীটি ? পাহাড়ের মাথায় ? রতি বিদেশে মানুষ তো ভালো বাংলা জানেনা ।

--শক্তের ভক্ত নরমের যম । কথাই আছে । আমার পারিবারিক পেশা অথবা সি-গ্রীন চোখ আমার সমস্যা নয় । সমস্যা, আমার হাতে তখন যথেষ্ট অর্থ আর পাওয়ার ছিলো না । আজকে দেখো , সেই একই মানুষেরা আমার পা চাটছে । দুটো লাথি কষালেও কুত্তার দল এসে ঘিরে ধরছে । আমি হয়ত লোকের প্রিয়পাত্র নই কিন্তু করে দেখিয়ে দিয়েছি যে কী করে পাথরকে সোনা করতে হয় । আগামী প্রজন্ম অনেক স্মার্ট । ওরা সেটাই মনে রাখবে । ওরা লজিক্যাল , আনবায়াসড্ আর ফেলো কড়ি মাখো তেল বোঝে ।

পাইসা ফেক্ তামাশা দেখ্ ।

টাইম ইজ মানি , মানি ইজ টাইম বোঝে আর প্রফেশন্যাল ।

ওরা সাইবার জেনেরেশান--মোবাইল মানুষ । এরাই তো চাঁদে যাবে ছুটি কাটাতে । নাহলে আর কে যাবে ? থুড়থুড়ে বুড়ো -- শ্রীযুক্ত বাবুমশাই নব্যনবীন করালীচরণ ঘটক ? যে উনিশ থেকে বিশ হলেই গেলো গেলো রব তোলে ?

ইয়াং মানুষদের আমি বলি **জে জি** । জুপিটার জেনেরেশান ।

হাহাহা করে দিলখোলা হাসি হেসে ওঠে নষ্ট কথাসাগর শাহিন ।

যার বাক্য শুরু হয় অত্যন্ত নোংরা গালি দিয়ে আর শেষও হয় সেইভাবে ।

--মানুষ ওকে ঘৃণা করেছে ওর বাবার পেশার জন্য । ও সমাজে ওপরের দিকে উঠতে গিয়েও বাধা পেয়েছে । অপমানিত হয়েছে বার বার । তাই পরেছে এই শক্ত মুখোশ । ওকে পরতে হয়েছে , নিজ অস্তিত্ব রক্ষার জন্য । কার মনে কী তা মুখে ফুটে ওঠার আগেই ও নির্মূল করে দিয়েছে সমস্ত কড়া সমালোচনার সম্ভাবনা ওর কটূ ভাষণ দিয়ে । আগেই অন্যকে তার ইন্‌সিকিউরিটি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে যাতে ওকে আক্রমণ করতে না পারে ।

ও তো একটা মানুষ রে বাবা ! কত সহ্য করবে ? ওর বাবা মুখে আগুন নিয়ে খেলতেন । তাই ও অচ্ছ্যুৎ । ও আর কোনোদিনই সমাজে উচ্চস্থান দখল করতে পারবে না । যতই যোগ্যতা থাক আর মন পরিচ্ছন্ন হোক না কেন ! মানুষের কাজ ও স্বভাব না দেখে এরা শুধু কে কার বাবা, কার ছেলে এগুলো দেখে । সেইটুকু সম্বল করেই অনেক অপোগন্ড সমাজের

শিখরে গিয়ে বসে । আর এদের মতন সৎ , ক্ষমতাসম্পন্ন মানুষদের ভারতীয় সমাজ পুড়িয়ে ছাই করে দিতে চায় ।

ওর অদ্ভুত চোখের জন্য ওর মায়ের চরিত্র নিয়ে গসিপ তৈরি করে ।

বলে --- গোড়ায় আঘাত করো ।।এমনভাবে পেছনে লাগো যাতে মানসম্মান নিয়ে বাঁচতে না পারে । কতদিন লড়বে একা একা ? একদম শুইয়ে দিতে হবে । এক এক করে পরিবার , বাবা ও মা সবার চরিত্রহনন করো । সবার গায়ে কাদা ছেটাও । দেখবে মান- ভয়ে চুপ করে যাবে । প্রয়োজনে মিডিয়াকে পয়সা খাইয়ে পেছনে লাগিয়ে দাও ।

তাই এখন শাহিন নিজেই গোড়ায় আঘাত করে । এক মাঘে শীত যায়না ! এখন সময়টা ওর । কাজেই ওকে ছাড়া রাঘব বোয়ালদের চলেও না !

কেউ ওকে ছেঁটে ফেলতে পারেনা । ও সব পুড়িয়ে ছাই করে দিতে চায় । মানবজীবন থেকে ,সভ্যতা নামক -অসভ্যতার আবরণকে । আচ্ছা ভারতে কি কোনো পরিবর্তন আসবে কোনোদিন ?

রতি হাসে । মৃদু হাসি । তারপরে বলে : ভারত কেন বিদেশেও এইসব শ্রেণীবিভাগ আছে । ওখানে আইন অনেক বলিষ্ঠ আর জেনেরাল পাবলিক সুসভ্য কাজেই আমাদের মতন সবাই কাছা খুলে সব করেনা ।

ইংল্যান্ডে আমার এক বান্ধবী ছিলো। ও অন্যদেশে চলে গেছে । কারণ ওর বাবা ও মা সাধারণ কর্মী । খেটে খাওয়া ক্লাস । বাবা প্লাম্বার আর মা টেলিফোন দপ্তরে কাজ করে । তাই ওদের লোকে হেয় করে । ওরা অক্সফোর্ডে , কেম্ব্রিজে , ইম্পেরিয়ল কলেজে পড়েনি যে । ওদের বাবা মায়েরা কোনো ডিউক বা আর্ল এর সাথে যুক্ত নন । কাজেই এসব সর্বত্রই আছে । আরেক বন্ধু থাকে বিদেশে । সেও বিদেশিনী ।

স্বর্ণ কেশী , নীলনয়না ।

তার আবার পয়সার অভাব নেই । কিন্তু গ্রাম থেকে অর্থাৎ কান্ট্রী থেকে আত্মীয় পরিজন , বন্ধু বাড়িতে এলে ওদের পেট -ফুড খাইয়ে দিতো ।

বিদেশে কুকুর বেড়ালের জন্যও বিশেষ খাবার পাওয়া যায় ।

বিবিধ মাংস , বিরিয়ানি , হাড্ডী , মেটে , মাছ, সসেজ । সেগুলো নিয়ে রান্না করে দিতো । দাম অনেক কম পড়তো । বলতো : গেঁয়োগুলোর আবার অত কি ? কান্ট্রী থেকে এসেছে , ওগুলোই খাক্ ।

সুতরাং এসব সবখানেই আছে । ভারতে একটু বেশিমাত্রায় । সময় শ্রেষ্ঠ বিচারক । সময় দাও -জল আর দুধ আলাদা হয়ে যাবে । মানুষ যতই রং চয়ন করুক সময় কিন্তু ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইটে চলে । দুধ আর জল পৃথক করে দেয় আবর্জনা ঝেঁটিয়ে বিদায় করে ।

আজকে দেখো শাহিন কোথায় আর অপমান করতো যারা তারা কোথায় ! শাহিনের ফিজ ও কর্মক্ষেত্রে সম্মানের ধারে-কাছে কেউ নেই ।

দেশে টপ ২৫ জন কম্পিউটার ফরেন্সিক এক্সপার্টের মধ্যে ওর নাম আসে । সাইবার ক্রাইম বাড়বে বই কমবে না । কাজেই চুলোয় যাবে তারা যারা এতদিন ওকে এইভাবে হ্যারাস করে এসেছে ।

মিঠাস্ চুপ করে শোনে । ওর ভালোলাগছে হয়ত । মধুর আবেশে চোখ চক্‌চক্ করছে --- in sickness and in health, to love and to cherish, till death do us part-----

রতি ভাবে ও তো অনেক জ্ঞান দান করলো কিন্তু ওর নিজের জীবনে এরকম দিন কবে আসবে ? কবে দুধ কা দুধ আর পানি কা পানি হয়ে যাবে ?

আজকাল ওর মনের বাগানে আনাগোনা করছে হারুণ । ওর বাদশাহ্ শারিয়ার । শাহ্‌জাহান । অথবা সম্রাট আকবর !

মানুষটি ওকে সর্বত্র ফলো করে । কিন্তু শিস্ দেয় অন্য কেউ । সে যে কে ও জানেনা শুধু এক অদ্ভুত মায়াজালে জড়িয়ে ঐ

শব্দকে অনুসরণ করে । ওর ভালোলাগে । শান্তি পায় । অশান্ত মন-সমুদ্রে , শীতলতা আনে এই শিস্ তরঙ্গ । ভাইব্রেশান ।

হারুণ সোনালী প্যান্ট আর রূপালী জামা পরে থাকে । সেই গ্ল্যামার ওয়ার্ল্ডের নায়কদের মতন । একদিন ডেকে জিজ্ঞেস করলো : তুমি কী করো ? কোথায় থাকো ? তুমি আসলে কে ? কি তোমার পরিচয় ।

হারুণ চট্পটে । স্মার্ট । বলে : আমি এক চিকিৎসক । **Maxillofacial Surgeon,** এখন পরিব্রাজক ।

রতি আরেক অদ্ভুত গল্প শুনলো । এই জাতের সার্জেনদের নাকি বহু দেশে ডেন্টাল আর মেডিক্যাল দুটৈ পড়তে হয় প্লাস সার্জারিতে দক্ষতা আনতে হয় । কাজেই অনেক সময় লাগে । হারুণ প্রফেশন্যালি কোয়ালিফাইড তো হয়েছে কিন্তু কাজ করার ইচ্ছেটা চলে গেছে । পড়তে পড়তে পড়তে মাথায় আর কিছু ঢোকে না । মাথা জ্যাম হয়ে গেছে ।

বন্ধুরা বলে : ও পাগলিয়ে গেছে । তাই জীবনের বাকি সময়টা হেসে খেলে কাটাতে চায় । পথে পথে ঘোরে ।

রতির মতন কোনো রূপসীর আশায় ?

----অনেক স্বপ্ন নিয়ে চিকিৎসা জগতে এসেছিলাম । ফ্যান্সি কার বা মিলিয়ন ডলার হোমের আশায় নয় । রুগীকে সুস্থ পরামর্শ ও চিকিৎসা দিতে পারবো ভেবে । কিন্তু হাজার হাজার সমস্যায় আমাদের হাত-পা বাঁধা । ইন্সুরেন্স কোম্পানি , ওষুধ কোম্পানির প্রলোভন , উনিশ থেকে বিশ হলে লিগাল কেসে ফেঁসে যাওয়া , রুগীদের চিকিৎসকের ওপরে ডাক্তারি করা, ডক্টর গুগুল পড়ে এসে -ক্ষোদার ওপরে ক্ষোদগারি এবং মোলেস্ট করে দিয়েছে রুগীকে চিকিৎসক ,এই অপবাদ- এই স্ক্যাম থেকে নিজেকে বাঁচাতে গিয়ে প্রবল স্ট্রেসের সম্মুখীন হওয়া ---একইসঙ্গে এতকিছু আমি সামলাতে অক্ষম । কাজেই আমি ডাক্তারি না করে এখন মেডিক্যাল রাইটিং করি । একটি ওষুধ কোম্পানির হয়ে লিখি । এসব স্পেশালাইজড্ জিনিস লিখতে গেলে মেডিক্যালের মানুষ হলেই সুবিধে । নার্স, চিকিৎসক, প্যারা মেডিক্স ইত্যাদি । কাজেই আমাকে ওরা স্বাগত জানিয়েছে । এতে স্ট্রেস কম ।

সিস্টেমের বলি আমি ; কোনোদিনই মনের মত রুগীর সেবা করতে পারবো না বুঝতে পেরে আমি ফিল্ড বদলে নিয়েছি । অল্প স্বল্প লিখতে পারি স্কুল থেকেই । আর আমার শিক্ষা আমাকে বাকি শার্পনেস দিয়েছে ।

অনেক জেনেছি দুটি ভিন্ন ডিগ্রী করে । এখন নিজ জ্ঞান আমি অকাতরে বিলাই । তবে ফ্রিতে না । মোটা কড়ির বদলে । অন্য সময় নিজের মতন লাইফ কাটাই, তোমার মতন রূপসীদের স্টকার আমি তখন ।

হা হা হা ---হাসির হিল্লোল ---হো হো হো -----!!

" অর্গানিক ডাবের জল খেতে খেতে তোমায় দেখি , সুন্দরী অমলা , অধরা রতি ,

তোমার দেহজুড়ে নামে চাঁদনী , চন্দনগন্ধ -

হিয়ায় নামে মৌসুমী বাতাস ;

ঘিরে থাকে অপরূপ , অবিনশ্বর এক জ্যোতি । "

দেখো অল্প স্বল্প কবিতাও পারি । আসলে মানুষের দেহ কবিতায় চলে ।

শরীরের কোথায় কি হচ্ছে তা কি কোষেরা তোমার পারমিশান নিয়ে করে ? টিস্যুরা তোমার থেকে সই নেয় কিছু করার আগে ? তবুও দেখো কি অপূর্ব সুছন্দে চলেছে দেহলতা তোমার । বছরের পর বছর । কে লিখেছে এই উচ্চাঙ্গের কবিতা ? এই ছন্দ ? আচ্ছা তোমরা তো কবিতার শেষে ছন্দ মিলাও । আমি

এমন কবিতা লিখেছি যেখানে ছন্দ শুরুতে মেলানো --শুনবে একটা ?

রতি আমি তোমার প্রেমে পাগল

মতি দিয়ে তাই সাজাবো তোমায়

জোছনা আলোয় ধুয়ে রাখি মন

মূর্চ্ছনা তার আবেগে ভাসায় ।

সাগরবলাকা হোক তোমার জীবন

মেঘবলাকা আঁচলখানি

ঠাঁই দিও তুমি সেই আঙিনায়

যাই বারতা আনুক বসন্ত বাহার

ফুল দিয়েই হোলি খেলবো আমি

ভুল হলেও বিষকন্যা হবে না কখনো !!

হারুণ কিন্তু দুর্দান্ত এক মানুষ , মানব জমিনের অংশ যে ভাঙে , গড়ে আবার ভাঙে --এক জন্মেই । কারণ ওরা পরজন্মে

বিশ্বাস করেনা । আর পরজন্ম সত্য হলেও কি রতি আর হারুণ একে ওপরকে চিনতে পারবে ? স্বামী স্ত্রী হয়েও ?

যা হয় হোক্ এখনই হোক্ । প্রেম হোক্ , ফুটুক কুঁড়ি , ফুল হোক্ অথবা আসুক ভ্রমর --সব তবে এখনই হোক্ ।

হারুণ ওকে নিয়ে গেলো একটি রাজ্যে ,নাম মণিকন্ঠ ।। ভারতের মতন দেশে এরকম শহরও আছে অনেক । এখানে বেশিরভাগ রিফিউজিরা থাকে । সমস্ত এলাকা জুড়ে রিফিউজি , উদ্বাস্তু মানুষ । কেউ প্রথম প্রজন্ম , কেউ বা দ্বিতীয় । এরাই শহরের মণি, রত্ন । মানিক্য । চুণী পান্না ---

এখানে আছেন এক সাহেব । খাস্ বৃটিশ, ফিলিপ ফ্লাওয়ার । অক্সফোর্ডে পড়তেন, রিফিউজিদের নিয়ে । পরে গবেষণার জন্য এখানে আসেন । উদ্বাস্তুদের কত দু:খ । জমিজমা সমস্ত ছেড়ে, হিংসার কারণে অথবা জীবন যন্ত্রণার দায়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন দেশে পাড়ি দেওয়া । সেখানে নতুন ঘর বাঁধা । নতুন পরিবেশ । খাওয়াদাওয়ার কোনো ঠিক নেই । অভিজাত থেকে কখনো বা মার্জিনাল জীবনে অভ্যস্ত হওয়া । ছেলেপুলেদের অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ , শরীর স্বাস্থ্যের করুণ-দশা । কখনো কখনো সন্তান ও পরিবারের যুবক যুবতীর হারিয়ে যাওয়া --সবকিছু সামলে কী করে তারা বেঁচে থাকে হাসিমুখে এই ছিলো গবেষণার

বিষয় । সমস্ত ইমোশান্স্ , হৃদয়ের টান বাতাসে উড়িয়ে দিয়ে - সুবিশাল বাড়ি , দালান অথবা নিজ ছোট্ট কুটির ছেড়ে ফুটপাতবাসী হওয়া ও আবার উঠে দাঁড়ানো---সত্যি আরেক বীরগাথা ।

এক কলকাতাবাসী মানুষ যার দেশ উত্তরবঙ্গে এবং বেশ অবস্থাপন্ন মানুষ সেখানকার , সে কাজ করতো ব্যাঙ্কের কেরানি হিসেবে । অর্থাৎ ধনীর অপোগন্ড সন্তান । বিয়ে করেছে নিজের মাসতুতো বোনকে । পাত্রী দেখার কষ্টটুকু করার জন্যও বাইরে কোথাও যায়নি । সে বাংলাদেশের উদ্বাস্তুদের ওপরে হাড়ে চটা ।

---সব পালে পালে আসছে বাঙাল । পাল পাল- মোল্লাদের তাড়া খেয়ে । এক বিখ্যাত রসরাজ এদের নিয়ে লিখেছেন ।

ফিলিপ বলেছিলেন : সবাই আপনার মতন তো ভাগ্যবান হননা । বাবার হোটেলে খেয়েও লেখাপড়া শিখতে পারেন নি । আর স্ত্রী জুটিয়েছেন পরিবার থেকে বেছে নিয়ে । যাদের ভিটে মাটি ছেড়ে অজানায় পা বাড়াতে হয় তাদের দু:খ আপনি বুঝবেন কী করে ?
হাসির লেখা পড়ে রেগে যাওয়া অনুচিত কিন্তু মজা আর ব্যঙ্গ দুটি আলাদা । আপনার কথা যদি মানতে হয় তাহলে রসরাজ যাকে বলছেন তার সুক্ষ্ম রসবোধ কতটা ছিলো তা তর্কের বিষয় ।

ফিলিপের এক ভারতীয় বন্ধু বলেছিলো : ওহ্! তুমি ওকে এগুলো বলেছো ? ঐ অশোক চ্যাটার্জ্জীকে ? লোকে ওর সাথে তর্ক করেনা । বড়লোকের লক্কা পায়রা । লোকে বলে : ল্যাজ কাটা শেঁয়াল ।

নিজের মাসীর মেয়েকে , বয়সে সাত বছরের বড় শিলাকে নিয়ে ফষ্টি নষ্টি , পেটে বাচ্চা এসে গিয়েছিলো । বাপ -মা রাতারাতি বিয়ে দিতে বাধ্য হয় । এখন আবার লম্বা লম্বা হাঁকছে ! এরাই বেশি বলে ।

নিজেকে কিছু করতে হলে বচন বেরিয়ে যেতো । কিছু কর, করে দেখা -তবে তো তোর ফুটানি লোকে শুনবে !!

ফিলিপ বিয়ে করেন এক লোকাল মেয়েকে । নাম তার কবরী । কবরী খান্না । ইদানিং কবরী বিখ্যাত । বেদনাদায়ক এক রোগের কবলে পড়ে । বিখ্যাত তার উদ্বাস্তু প্রেমী , অক্সফোর্ড ফেরৎ স্বামী । খাঁটি সাহেব -ফিলিপ ফ্লাওয়ার । শর্টে ফিল ।

হারুণ, তার মানসী রতিকে নিয়ে গেলো ফিলিপের কাছে । আজকাল অত সহজে যাওয়া যায় না । প্রেসের ক্যামেরা ধাওয়া করে তাকে । বিখ্যাত যে । প্রেসের সাহায্য না নিলেও আছে ইউ- টিউব । বিখ্যাত হওয়া সহজ আজকাল । ফিলিপের অত্যাশ্চার্য কাহিনী কি মিডিয়া জানে ? মনে হয় না । সত্য গোপন আছে এখনও ।

শুধু জানে রতি আর হারুণ ।

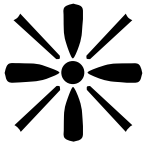

চন্দনকাঠ

--আমার ওয়াইফের একটাই ইচ্ছে ছিলো যে ও মারা গেলে ওকে যেন আমি চন্দনকাঠের চিতায় পুড়াই । আমার কাছ থেকে ও কথা নিয়ে নিয়েছিলো ।

বলেছিলো : তুমি আমাকে ছুঁয়ে প্রমিস করো ।

আমি প্রমিস করেছিলাম । তাই কথামতন ওকে চন্দন-চিতায় শুইয়েছিলাম ।

ও যেদিন মারা যায় সেদিন বিকেলে ওকে আমি চন্দনকাঠের চিতায় শুইয়ে আগুন লাগাই । সনাতন হিন্দু মতে । আমাদের কোনো সন্তান নেই । কাজেই আমিই মুখাগ্নি করি । ও আগের দিন শেষরাতে মারা যায় । দেহে তো পচন ধরে গিয়েছিলো ।

তিন-তিনখানা ক্যান্সার হয়েছিলো একসঙ্গে । কাজেই ডাক্তার বেশিক্ষণ রাখতে বারণ করেন । আমি ওকে পুড়িয়ে ফিরি রাতে, ওর শরীরে চন্দনের প্রলেপ দিয়ে। কিন্তু মানুষের কাছে ও তখনও জীবিত । ঐ চন্দনকাঠের সুগন্ধে আমি টিস্যুর কটূ গন্ধটা পাইনি । কুকুরেরা পায় । একটি ল্যাব্রাডর কুকুর মোট ৫৫১ জন ক্যান্সার রুগীকে সতর্ক করে দিয়েছে স্রেফ শুঁকে , তাই তাদের প্রাণ বেঁচেছে । ওদের বলে মেডিক্যাল ডগ । ওরা ট্রেনিং নেয় এইসব ব্যাপারে । ওকে ব্লু ক্রস মেডেল দিয়েছে । ওদের এই শুঁকে দেখে রোগ নির্ণয় করা প্রায় ৯৩ ভাগ অ্যাকিউরেট ।

আমার এক বন্ধু ছিলো , অক্সফোর্ডে আমার সাথে পড়তো । তার নাম শণ ।

ওর বোন চীনা মেয়ে লাবাং । সে একটি অদ্ভুত কাজ করতো । মানুষের ডায়জেস্টিভ সিস্টেম থেকে নির্গত বায়ু শুঁকে দেখতো ।

ওদের বলে : প্রফেশন্যাল ফার্ট স্নিফার ।

ওরা গন্ধ শুঁকে চিকিৎসকদের বলে -কার গন্ধ কেমন । তখন ডাক্তারেরা অ্যানালাইজ্ করে বার করে যে বডিতে কী কী গ্যাস , ইনফেক্শান , কেমিক্যাল ও পদ্ধতি কাজ করছে । তাতে করে রুগীর রোগ নির্ণয় সহজ হয় । লাবাং মাইনেপত্র খুব ভালো পায় । বছরে মোটা পে-চেক্ পায় ।

তবে এইসব মানুষের ঘ্রাণশক্তি খুব ফাইন হতে হয় , অনেকটা ডগদের মতন । আর প্রকাশ করার ক্ষমতাও হতে হয় তীক্ষ্ণ । কাজের জন্য কিনা জানিনা মেয়েটির জীবনে কোনো সুগন্ধ নেই । ও কখনো কোনো পারফিউম ব্যবহার করেনা ।

ইউ-টিউবে ক্যান্সার নিয়ে ভিডিও পাবলিশ হচ্ছে একের পর এক । কবরীকে নিয়ে । কোটি কোটি মানুষ দেখছে । ভরসা পাচ্ছে । ক্যান্সার মানেই কফিনে শেষ পেরেক নয় । ক্যান্সার ত্রয়ী সত্ত্বেও চিকিৎসা আজ বাঁচিয়ে রেখেছে আমার স্ত্রী কবরী খান্নাকে । ওরা চাক্ষুষ করছে । কোনো কম্পিউটার কলা নয় , মর্ফিং নয় । স্বচক্ষে ওরা দেখছে ।

লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মানুষ । কবরী সাক্ষাৎকার দিচ্ছে । লাইভ প্রশ্নের সমস্ত জবাব দিচ্ছে । নতুন ক্যান্সার রুগীদের ভরসা দিচ্ছে ।

রেডিয়েশান নিয়ে একাঙ্ক নাটক , কিমো (কেমোথেরাপি) নিয়ে গান , কবিতা পাঠ চলেছে ক্রমাগত । মানুষের মনে ক্যান্সার নিয়ে যে ভয় তা আস্তে আস্তে কেটে যাচ্ছে । আক্রান্ত মানুষ তো বটেই , অন্যরাও ভয়কে জয় করতে সক্ষম হচ্ছে । ক্যান্সার তোমার আত্মায় মেটাস্‌টেসাইজ্‌ করতে পারবে না ।

ক্যান্সার কান্ট ইনভেড্‌ ইওর সোল । ইওর কনশাস্‌নেস ।

ক্যান্সার সারভাইভারদের কাছে একবছর কাটা মানে আরেকটি জন্মদিনের মতন ---অ্যাম স্টিল অ্যালাইভ ।

ক্যান্সার এখন ওদের রিয়ালিটি । এটা নিয়েই ওরা হেসে খেলে বাঁচে । আরো একটা রাত কাটলো , আরো একটা সকাল এলো সোনার পেখম মেলে ।

কিমো ইনফিউশান নিতে গেলে মনে হয়না : হোয়াই মি ? আজকাল রুগীরা অনেক ম্যাচিওর্ড । ওরা ভাবেন : হোয়াই আস্ ? কেন এতমানুষ এই আধুনিক যুগে ভয়াল এই ব্যাধির শিকার হচ্ছে ? কেন ?

দেহে তো কোটি কোটি কোষ , কোষের মেলা । তার ভেতরে কিছু যদি অন্যরূপ ধারণ করে তার জন্য এত ভেঙে পড়ার কী আছে ?

সমস্যা হল লোকে ক্যান্সার মানেই ভাবে মৃত্যু ঘন্টা । আসলে এটা অনেক পুরনো ধারণা , থিওরি । আজকাল মানুষ অনেকদিন বাঁচে ।

এক ভদ্রমহিলা দুই মেয়েকে দত্তক নেন ক্যান্সার চিকিৎসার পরে । ২০ বছরের ওপর বেঁচে আছেন । চার ও পাঁচ বছর বয়সের সেই দুই মেয়ে , সুচিত্রা আর হোলিকা এখন বিবাহিতা

। ওদের ক্যান্সার সারভাইভার পালিতা মা নাতি-নাত্‌নির মুখ দেখার জন্য উন্মুখ ।

মাঝে একবার ক্যান্সার ফিরে আসে কিন্তু উপযুক্ত চিকিৎসায় উনি বেঁচে ওঠেন । মধ্যে ১২বছর কেটে যাওয়াতে ওষুধ-পথ্যি অনেক অ্যাডভান্স হয়ে গিয়েছে । রোজই নতুন ওষুধ বার হচ্ছে । পুরোদমে চলেছে গবেষণা । আজকাল কিমোথেরাপির বদলে অনেকে টার্গেটেড থেরাপি ও অ্যান্টিবডি থেরাপিও নেন । দেহের প্রতিরক্ষার জন্য একধরণের কোষ আছে । তাদের শরীর থেকে বার করে নিয়ে বিশেষ অস্ত্র শস্ত্র সমেত আবার শরীরে প্রবেশ করানো হয় । তখন তারা ক্যান্সার কোষকে আক্রমণ করে ।

ওষুধ কোম্পানির একের পর এক ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল নিচ্ছে কবরী খান্না । জয় করছে এক এক করে তিন তিনখানা ক্যান্সারকে ।

মোট ২৬খানা কিমো ড্রাগ্‌স্‌ নিয়েছে সে । কয়েকটি কাজ করেনি বলে টার্গেটেড্‌ থেরাপি নিয়েছে । কিমো ইন্‌ফিউশান নিতে নিতে করছে কিমো গান । জীবনের গান । লোকে হামড়ে পড়ে দেখছে । হিট্‌স হচ্ছে অনেক অনেক । লোকে ফোন করছে । সে এক মহাযজ্ঞ । মহাকান্ড । মহা মিলন ক্ষেত্র । মানুষের । অসুস্থ ও সুস্থ দুই পক্ষের -ই ।

ক্যান্সার ক্ষারে বাঁচেনা । অম্লতে বেড়ে ওঠে । দেহকে অম্ল মুক্ত করতে হবে । দেহে ক্ষার সঞ্চার করুন ।

হজ্‌কিন্স লিম্ফোমা (ব্লাড ক্যান্সার), থায়রয়েডের একটি ক্যান্সার আর ইন্টেস্‌টাইনের ক্যান্সার । এই ত্রয়ীকে জয় করেছিলো কবরী । সত্য হল থায়রয়েড এর জটিল ব্যামো আর হজ্‌কিন্স লিম্ফোমা খুবই কিউরেবেল । সমস্যা হল অন্ত্রে ধরা পড়ায় । বেশিদিন বাঁচেনি । দ্বিতীয় কিমো নিতে গিয়ে মারা যায় । নিতে পারেনি কিমো । কিন্তু লোকসমক্ষে তা আনা বড় কঠিন । লক্ষ লক্ষ লোক ওকে ফলো করছে । অনেকে জীবনের এই শেষ সোপানে এসেও আবার উঠে দাঁড়াচ্ছে । নতুন করে যুদ্ধে নামছে , তখন কি বলা যায় যে আপনাদের অসুখ নগরের রাজকুমারী হেরে গেছেন ?

বলা যায় না । সব খবর ঘোষিত হয়না । কিছু কিছু সত্যকে ঢেকে রাখাই শ্রেয় বৃহৎ সংখ্যক মানুষের স্বার্থে । ওরা উৎসাহিত হচ্ছে । অনেকে পজিটিভ মাইন্ডসেট থেকে সাহস, জীবনীশক্তি সঞ্চয় করে আবার নতুন করে কিমো নিয়ে সুস্থতার দিকে পা বাড়াচ্ছে । কবরী খান্না পেরেছেন , আমরাও পারবো । আমরাও ফাইটার । উই শ্যাল ওভারকাম , দিস ডেড্‌লি ডিজিস।

বোয়িং কোম্পানির কর্মী , প্লেন সারানোয় এক্সপার্ট মাইক হল স্টেজ ফোর ক্যান্সারের রুগী ।কবরী খান্না তার কাছে দেবী ।

এই ভিডিও দেখেই ভদ্রলোক চিকিৎসায় উৎসাহ পান । উনি পেরেছেন -আমিও পারবো ।

কিমো নিয়েই উনি, নিজের মাছ ধরার বোটে করে তিন-চারদিন একটানা মোহনায় মাছ ধরতে যেতেন । স্যামন্ , লিং । কখনো বা শাঁসালো কাঁক্ড়া ।

মনোবল সাংঘাতিক বেড়ে গিয়েছিলো কবরীর ভিডিও দেখে দেখে ।

মাছ ধরো , স্যাঁকো , ভাজো , জাপানীদের মতন কাঁচা খাও । জীবনকে উপভোগ করো । প্রতিটা মূহুর্ত । ততক্ষণে ক্যান্সারের নতুন ওষুধ কেউ না কেউ ট্রায়াল দিয়ে বাজারে নিয়ে আসছে ।

এই সেট আপে চরম সত্য বলা যায়না । সত্য সবসময়ই তেতো । কাজেই কবরীর চলে যাওয়ার খবর কেউ জানেনা । আজও ওরা ভরসা করে আমাদের । কবরীকে ফোন করে । ইমেলে মেসেজ পাঠায় । শলাপরামর্শ করে , ভরসা পায় এইভাবে ।

ব্লাড ক্যান্সার রুগীর জন্য, বোন-ম্যারো ডোনেট করার অনুরোধ নিয়ে একটি সংস্থা খুলেছে, একটি কলেজে পড়া মেয়ে শ্যারণ । বিদেশে থাকে । ওর নিজের দেশে, কোনো বোন-ম্যারো ডোনেশানের ব্যবস্থা নেই বলে বহু মানুষ ব্লাড ক্যান্সারে মারা যায় । কারণ অনেক ক্ষেত্রেই অন্যের বোন ম্যারো, বাঁচাতে পারে সম্পূর্ণ অপরিচিত কোনো ব্যাক্তিকে

যদি সেই ম্যারোর নানান প্যারামিটার ম্যাচ করে । একই জাতের মানুষের ম্যারো ম্যাচ করার সম্ভবনা বেশি কিন্তু এই নিয়ে জনচেতনা না বাড়ালে ডোনেশান আসবে না । মারা যাবেন অনেক মানুষ কেবল কিছু কোষের অভাবে । হয়ত তাদের কটি শিশু অনাথ হয়ে যাবে অথবা পঙ্গু স্বামী হবেন অসহায় !

কবরী খান্না নিজেও স্টেম সেল, ম্যারো দানের জন্য মিনতি করেন ।

----দুনিয়ায় ক্যান্সারই একমাত্র বস্তু যা কেউ প্ল্যান করে আনেনা ।

---কিন্তু ফ্যাক্টটা এখন কি ? কে এই নতুন কবরী খান্না ? বাতাস প্রশ্ন করে ।

ফিলিপ হাসেন । জোরে জোরে হাসেন । সঙ্গে হাসে ওর রাইট হ্যান্ড রাজু । এক কম্পাউন্ডার । ক্যান্সার হাসপাতালে কাজ করতো । চালাক চতুর ছেলে । জানেও অনেক । ক্যান্সারের কবলে পড়ে অনেক রথী মহারথীকে ছট্‌ফট্‌ করতে দেখেছে । মারা যেতে দেখেছে । দেখেছে মানুষ এই ব্যাধির সামনে কত অসহায় । এই অসুখ রাজা উজির চাকর কাউকেই রেয়াৎ করেনা । দেখেছে কেবলমাত্র ধনী আর অনেক পয়সা খরচ করতে পারে বলে মৃতপ্রায় ক্যান্সার পেশেন্টকে, তার ইচ্ছের

বিরুদ্ধে বাঁচিয়ে রেখেছে । চলেছে নানান ওষুধ বিষুধের পরীক্ষা । কোথাও নতুন ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল বেরিয়েছে শুনলেই সেখান থেকে আসছে সেই মেডিসিন । অনেক সময় তার নামও দেওয়া হয়নি এমন প্রাইমারি স্টেজে সে আছে-- তখন তাকে এনে দেহে সংযোজন করা হচ্ছে ।

রুগী হয়ত বলছে ---আমাকে ছেড়ে দাও । লেট মি ডাই ইন পিস্ ।

কিন্তু শুনছে কে ? ক্যান্সারের কাছে ইগোর হার, সহ্য হচ্ছে না ধনীদের । তাদের পায়ের তলায় সব ---শুধু এই অসুখ ছাড়া ।

শেষে শুধু রুগীর পচাগলা দেহ থাকছে । তার চেতনা থেকেও নেই । কোমায় চলে যাচ্ছে । মৃত্যুকে নিয়ে এত জটিলতা ও কদর্য কান্ডকারখানা নিজ চোখে দেখেছে রাজু । এখনও দেখছে ।

মানুষ ,পরিস্থিতির শিকার হয় । পরিস্থিতি মানুষকে বিভিন্ন চরিত্রের মুখোশ পরিয়ে, নাচিয়ে ছাড়ে ।

নাহলে ফিলিপের মতন মানুষ কী করে এই দুনম্বরী করছেন ? দিনের পর দিন ? কেন করছেন ? কী সত্য গোপন করতে চাইছেন ? সত্য কি গোপন করা যায় ? সত্যের ঝাঁঝ সাংঘাতিক । নিজে থেকেই বেরিয়ে আসে ।

বলা হয়নি মণিকন্ঠ রাজ্যে এই অদ্ভুত এলাকার নাম ঝাঁঝাঁ ।

এখানে দেড়খানা সুন্দরীর জন্ম হয় । কবরী ও শবরী । এরা কিন্তু দুই মাথাওয়ালা একই মেয়ে । শুধু দুটি মাথা । দুটি পাতা বা মাথা আর একটি কুঁড়ি বা দেহলতা । দুই মাথার এই মেয়ের একটি মাথা কেটে নেন সার্জেনরা । তারপরে দূর্ঘটনায় নিহত আরেক মেয়ের ঘাড়ে বসানো হয় দ্বিতীয় মাথাটি । হয়ে ওঠে দুটি অস্তিত্ব । দুই বোন । একইরকম দেখতে ওদের । একজনের উচ্চতা ইঞ্চি খানেক কম । তাতে কি ? উচ্চতা কি আর স্ক্রিনে মাপা যায় ?

ওরা দুজন তো রিল লাইফে জীবন্ত । রিয়েল লাইফে নয় । রিয়েল লাইফে একজন একটু বেঁটে । শবরী , যার দেহ অন্যর থেকে ধার করা হয়েছিলো ।

চিকিৎসা বিজ্ঞান এখন খুব উন্নত । মানুষের মাথা কেটে অন্যের দেহে বসিয়ে তাতে প্রাণ সঞ্চার করা যাচ্ছে । শুধু ক্যান্সারকে জয় করা যাচ্ছে না ।

কাজেই শবরী, কবরী খান্না হল ।

দুজনে একই সাথে বেড়ে ওঠে ।

মাথায় যেসব নার্ভ আছে সেগুলি অন্যের দেহে কাজ করবে কিনা এগুলো চ্যালেঞ্জ ছিলো । এখন সেই চ্যালেঞ্জ আর নেই । এটা বাস্তব । শুনলে অবাক হবেন যে বিজ্ঞান দিয়ে কিন্তু মাথা জোড়া হয়নি । জোড়া হয়েছে প্রেম-আঁঠা দিয়ে । এই আঁঠা

পাওয়া যায় ভালোমানুষদের কাছে । ওদের সংরক্ষণ করার জন্যে সরকার থেকে মিউজিয়াম বানিয়েছে ।

শুধু ক্যান্সারটা যদি ------!

শবরী জ্ঞান হওয়া থেকেই খুব হীনমন্যতায় ভুগতো । কি তার পরিচয় ?

সহোদরার ফেলে দেওয়া মাথা আর অপরিচিত কারো বডি ? সে নিজে কে ? কি তার অস্তিত্বের প্রমাণ ? তার মন আসলে কার ? বোনের- নাকি দেহ যার রক্তমাংসে জারিত , তার ?

ভীষণ কষ্ট হত বুকের ভেতর । ও কিছু করে দেখাতে চাইতো । নিজের একটা পরিচিতি হবে । শবরী বলেই লোকে চিনবে ওকে ।

কিন্তু ওর জন্ম হয়েছে দেহ নিয়ে নাটক দেখাবার জন্য । কাজেই মঙ্গলে (মার্স) ইদানিং যে এসকর্ট সার্ভিস চালু হয়েছে সেখানে ও চান্স পায় । খুব কম মেয়েরাই সেখানে চান্স পায় । অত্যন্ত সুন্দরী ও চটকদার ছাড়াও স্মার্ট ও প্রেজেন্স অফ মাইন্ড চাই ।

নিজের অস্তিত্ব নিয়ে যে সন্দিহান সে এরকম লাইফ চেঞ্জিং ঘটনার সম্মুখীন হলে কি করবে ? যা করবে অন্যরা সেও তাই করলো । এসকর্ট সার্ভিসে নাম লেখালো । বিভিন্ন মাঙ্গলিক কেউকেটা ও পার্থিব রাঘব বোয়ালের সে এখন ক্ষণিকের

প্রেয়সী । স্পেস শিপে ওর মৈথুন হয় । মঙ্গলের পুরুষের দল আরো সাংঘাতিক । ওরা মৈথুনের পর সঙ্গিনীকে হত্যা করে ওদের বিষাক্ত লালা দিয়ে । ওখানে প্রজেনি বাড়ে পুরুষের দেহের জলীয় বস্তু থেকে ক্ষুদ্র কণা নিয়ে । ছেলে, মেয়ে , গে, লেসবিয়ান , নপুংসক সবরকম আছে । যেমন পশুপাখিদের মধ্যে আছে সমকামীরা ।

কিন্তু এখানে বেঁচে গেছে শবরী । যেহেতু ওর ধড় ও মুন্ডু একই লোকের নয় তাই ওর ইমিউনিটি সিস্টেম অনেক জবরদস্ত । ঐ লালা ও হজম করে ফেলেছে বিচিত্র রসায়নের কারিকুরিতে । তাতেই ওখানে ওর দাম বেড়েছে । মঙ্গলের পুরুষ -ওদের বলে মিঙ্গো -- তারা সবাই শবরীর সঙ্গলাভে আগ্রহী । লালা বিকিরণের নেশায় । দেখতে হবে এই কন্যা কেমন মাধুরী ছড়ায় ।

শবরী খান্না ,মঙ্গলের এসকর্ট যে মিঙ্গুর লালা হজম করে ফেলেছে । এটাই এখন ওর একমাত্র পরিচয় । ও ফিরে এসেছে পৃথিবীতে ।

তার কিছুদিন পরেই মারা যায় ক্যান্সারে আক্রান্ত কবরী খান্না ।

ওকে পুড়িয়ে ফেলতে হয় । ওর জায়গা নেয় শবরী ।

ফিলিপ বলেন : এসকর্ট হয়েছো , মিঙ্গুর লালা হজম করেছো , ভিনগ্রহের প্রাণীর ছোবল বরদাস্ত করা তো যে সে কাজ নয় কিন্তু মানুষের মঙ্গলের জন্যও কিছু করা হোক ।

এইভাবে বোঝানোতে সে নিজ সহোদরার জায়গা নিয়েছে ।

এখন সে ট্রেনিং নিচ্ছে ফিলিপের কাছে কী করে কবরী, রুগীদের বোঝাতো ক্যান্সার কোষের ব্যাথা । কোষের পার্সপেক্টিভ থেকে ক্যান্সার দর্শন । নিজ দেহের কোষকে যখন শরীরের শুভাশুভর বিরুদ্ধে বিভাজিত হয়ে যেতে হয় অসহায়ভাবে ,তখন তার ব্যাথাটা কেমন হয় ? প্রতিটি পদক্ষেপে দেহের বিরুদ্ধে কাজ করা । নিজেকে জেনেটিক্যালি আপডেট করে নিজ মৃত্যু রোধ । কেন ?

কারণ কোষেরা ভুল সংকেত পেয়ে পেয়ে নিজেদের চরম পরিস্থিতির জন্য বদলে ফেলেছে । ওদের নিজস্ব ক্ষুদ্র চেতনা আজ আশ্রয়দাতার ক্ষতি করছে ।

ওরা বুঝেও কিছু করতে অক্ষম । আগে ক্রমাগত সংকেত এসেছে , ভুল । কথায় বলে -- প্রথম যে কোষটি অস্বাভাবিক বিভাজন শুরু করে তার অনেক বছর পরে দেহে এই কর্কট রোগ ছোবল বসায় । ওরা নিজেদের সুস্থ করতে পারছে না । তাই ক্যান্সার ।

একজন মিডিয়াম আছেন । নাম ইন্দিরা রাণা। উনি এইসব ক্যান্সার রুগীদের মধ্যে সাহস বিলান --- মৃত্যুর পর আছে অন্য দুনিয়া । সেটা পৃথিবীর কার্বন কপি । বলে অ্যাস্ট্রাল জগৎ । সেখানে চলে যাবে তুমি। মৃত বন্ধু-আত্মীয়রা সেখানে তোমার জন্য অপেক্ষা করে আছেন । মৃত্যুর সময় দেখবে দেহের বাইরে চলে গেছো । তখন তুমি অ্যাস্ট্রাল ও মেন্টাল দেহ সম্পর্কে পুরোপুরি সচেতন হবে । এখানকার সবাইকে দেখতে পাবে , পর্যবেক্ষণ করতে পারবে সব -কারণ চেতনা থেকেই যায় । নানান ডায়মেনশানে ।

এসব শুনে মৃতপ্রায় অনেক মানুষই স্ট্রেস ফ্রি হয়ে এই দুনিয়া ত্যাগ করতে সক্ষম হন । শান্তিতে চলে যাওয়া যাকে বলে ।

মিডিয়াম, আবার অনেককে ,যারা ধ্যান করতে পারেন তাদের অ্যাস্ট্রাল জগৎ এর ভেতরে নিয়ে যান । ধ্যানের মাধ্যমে । প্রমাণ দেবার জন্য ।

ক্রস-ওভার করার পরে ঐ শান্তিময় পরিবেশে ওরা যাবেন ভেবে বা বুঝে অনেকেই আর দু:খ পাননা । চোখ খুলে যায় । বুঝতে পারেন যে এই দুনিয়া একটি নাটক । আবার ইচ্ছে হলেই এই নাটকে অংশ নিতে পারবেন ।

অন্যজগতে কেউ কাউকে জাজ্ করছে না । এক অপার শান্তি বিরাজমান ।

যারা রয়ে গেলো, তাদের এখানে হাত বাড়িয়ে ডাকছে জীবন । তারা পৃথিবীতে এই মূহুর্তে আছেন । এই সময় ও স্পেসের বন্ধনে- কিন্তু একদিন তারাও বুঝতে পারবেন অন্য ডায়মেনশানের শান্তিময় অস্তিত্বের কথা । তাই ক্যান্সার এর মতন অত্যন্ত গ্রস , পার্থিব অসুখ তখন বোঝা মনে হয়না আর ।

ক্যান্সারের জন্য দেহে ব্যাথা --বা মনের ব্যাথা যা কমেনা কোনো মরফিনেই আর স্পর্শ করেনা রুগীদের । এখন তারাই জয়ী । শুধু একটা পোষাক বদলানোর ব্যাপার , একটা অন্য ডায়মেনশানে নিজেকে প্রস্ফুটিত করার ব্যাপার । প্রতিরাতেই আমরা ঐ জগতে নিজেদের অনিচ্ছায় যাই । শুধু তখন একটি অদৃশ্য দড়ি যাকে বলে : সিলভার কর্ড তাই দিয়ে আমাদের দেহের সাথে আমরা যুক্ত থাকি । মরণ মানে সেই সিলভার কর্ড চিরতরে ছিন্ন করে ফেলা , নতুন স্বাদের খোঁজে । তখন আবার শান্তির ভুবন । নতুন মায়ের, নব গর্ভসঞ্চার হবার আগে পর্যন্ত ।

----উই আর স্পিরিটস্ ইন হিউমান বডি । বলেন মিডিয়াম ইন্দিরা রাণা । মারোয়াড়ের এক রাণার স্ত্রী এইসব বিদ্যায় পারদর্শিনী ছিলেন । তারই শিষ্যা ময়নামতী দেবীর কাছে এসব শিখেছেন ইন্দিরা রাণা । উনিও রাণা বংশেরই মানুষ । আজ রাজ্যপাট নেই , রাণীও নেই কিন্তু রয়ে গেছে শতাধিক কালের

এই গুপ্তবিদ্যা । যা কিনা বংশ পরম্পরায় বয়ে চলেছে ইন্দিরার মতন সুযোগ্যা শিষ্যার মধ্য দিয়ে ।

ইন্দিরা রাণা শুধু ভূত প্রেত পিশাচ নিয়ে খেলা বা ওঠাবসা করেন না । পার্থিব জগতের মানুষের জন্যও কাজ করেন । তাহল মৃতপ্রায় মানুষকে ভরসা দেওয়া । ভয় পেয়ো না , ওদিকে আছে আরো সুন্দর ভুবন । তোমার যাত্রা শুভ হোক্ ।

সংস্থার নাম : পরছাইয়া । বা ছায়া ।
--তোমাকে অনুসরণ করে তোমার ছায়া । সেই ছায়া কে ?
সেই আসলে তুমি । তোমার আত্মা । সুক্ষ্ম শরীর ।

ফিলিপের ক্যান্সার গ্রুপ, ইউ-টিউবে ক্যান্সার রুগীদের জন্য স্বাস্থ্যকর রেসিপি দেয় । সহজলভ্য , সহজপাচ্য খাদ্য । যা খেলে কিমো ও রেডিয়েশান নিলেও দেহ থাকবে সুস্থ , মন উজ্জ্বল ।

পুষ্টিকর কী কী খাবার খাওয়া যায় যা সাধারণ মানুষের আওতার ও বাজেটের মধ্যে তা তো অনেকেই জানেন না ।

কাজেই এই ভিডিও-ও সুপার ডুপার হিট । অনেক প্রশ্ন আসে কবরী খান্নার কাছে ।
ফার্স্ট হ্যান্ড অভিজ্ঞতা তার । তিন তিনখানা ক্যান্সারকে জয় করেছে কবরী খান্না !
কিমো নেবার সময় চুল ও লোম পড়ে যায় সবাই জানে । কিন্তু কীভাবে যায় ? পথে চলতে চলতে হঠাৎ বাতাসে উড়ে যাবে সব চুল নাকি ঘরের মধ্যে একদিন ঝুপ করে খসে পড়বে পাখির বাসার মতন কেশরাশি , কিমোর তান্ডবে ?

কিমো বিউটি থেরাপি ভিডিও এসেছে চাহিদার জন্য । কিমো নিয়ে, কিমো কাট চুলেও কী উপায়ে গ্ল্যামারাস হওয়া যায় ।
কী ধরণের ভেষজের ব্যবহারে ত্বক হবে চক্‌চকে , মুখ জ্বলজ্বল করবে মিউ ইউনিভার্সের মতন । সেসব বলা হয়েছে । বলা হয়েছে বায়োটিন, কর্পূর ইত্যাদি ব্যবহারের কথা।লাউ, আপেল,পেঁপে ,তরমুজ ,আম্‌লকি খেতে বলা হয় । সতেজ সবজির স্যুপ, উষ্ণ থাকতে থাকতে পান করো । এসব উপদেশাবলী থাকে ।

কোনো কোনো কালচারে মানুষ ব্যাথায় কোঁকায় । কাউকে সাহায্যের জন্য ডাকে না । কেউ কেউ আবার, কোথাও কোথাও চীৎকার করে যেন কেউ মারা গেছে ! ক্যান্সারের ব্যাথা অসহনীয় । সেই পেন ম্যানেজমেন্ট নিয়েও কথা বলেছেন কবরী খান্না । মানুষ আপ্লুত ।

ক্যান্সারের জন্য স্পেশাল মাসাজ হয় । সেই মাসাজ নিয়ে ব্যাথা কমে অনেক ক্ষেত্রেই । সেগুলি করা চলে পেন কমানোর কারণে ।

একজন ভদ্রমহিলা যোগাযোগ করেছিলেন । নিজের এক অদ্ভুত ক্যান্সার হয়েছে । টেরাটোমা । এই টিউমারের মধ্যে মানুষের চুল, হাড় , দাঁত , চোখ , হাত ও পা থাকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র । অন্যান্য দেহাংশও থাকা সম্ভব । ম্যালিগনেন্ট টিউমারগুলি অনেকটা বড় ফোস্কার মতন । অসম্ভব কুৎসিত দেখতে । মনে হবে যেন কোনো কল্প বিজ্ঞানের সিনেমা দেখছেন । ভদ্রমহিলা কিমো নেন । তাই যোগাযোগ করেন । কিমো সুন্দরী হতে চান । ওর টিউমারে, দুটি পূর্ণ চোখ , কয়েকটি চক্‌চকে দাঁত ও এলোমেলো কিছু চুল ছিলো । ঠিক একটি মুখের মতন ।

---এসব রুগীদের নিরাশ করে বলা চলে কি যে কবরী মৃতা ? কোটি কোটি মানুষের কবরী ভরসা । আজ আর সে মানবী নেই একটি কান্ট হয়ে উঠেছে । কাজেই তাকে বাঁচতেই হবে ।

শবরীকে বোঝাতে হয়েছে । কনভিন্স করতে হয়েছে -তবেই সে তার সহোদরার পোস্টে বসেছে । সে সুস্থ । ক্যান্সার কোনোদিনই হয়নি তার কিন্তু সেও কি তার বোনের দেহে গজিয়ে ওঠা আরেকটি টেরাটোমার মতন নয় ? শুধু মুন্ডু ?

আর ধর অচেনা কোনো মৃত ব্যাক্তির ? অসাধারণ সহন শক্তিরর জন্যই তো তার শরীর মিংগুর লালা হজম করতে পেরেছে । তাই আজ তার একটি পরিচিতি হয়েছে যদিও এসকর্ট বলে কেউ তার কথা জানেনা বড় একটা, নিজ গন্ডীর মানুষ ব্যাতীত ।

উপসংহার

রতিকে তার অবিনশ্বর শিস্ নিয়ে এসেছে এক পাথর রাজ্যে । আগে অন্য নাম ছিলো । এখন সরকার থেকে নাম দিয়েছে : সুহানাবাদ ।

ফিরোজাবাদে যেমন জগৎ জোড়া কাঁচের চুড়ির শিল্প আছে সেরকম এখানে আছে পাথর বসানো বালার শিল্প। এই সেমি প্রেশাস্ স্টোন বসিয়ে বসিয়ে বালা তৈরি হয় । একটি বালার খুব একটা দাম নয় ।

এলাকার মহিলারা এইসব কাজ করে । বালাগুলি ফরমাইশিও হয় ।

একবার তৈরি করে ছাঁচ নষ্ট করে ফেলা হয় ।

এরকমই এক বালা তৈরির কাজে যুক্ত এক বালা ,নাম তার নীতু ।

নীতুর সঙ্গে আলাপ হল রতির । হারুণ আর রতি ইতিমধ্যে কাছাকাছি এসেছে । ভাললাগছে ওর সঙ্গ । দুদিনের বান্ধবী

নীতু চোখে টিপছে ! হারুণ হারিয়ে গেছে অলীক কোনো রাজমহলে ।

নীতু নিজে কোনো বালা পরেনা । বালা তৈরি , এই কাজ করলেও ও রোজ সকালে কুস্তি প্র্যাকটিশ করে । ও কুস্তিগীর হতে চায় । অলিম্পিকে যেতে চায় । টিভিতে দেখে দেখে ওর এই স্বপ্ন লালিত হচ্ছে , পালিত হচ্ছে -নিজেকে গড়ে তুলছে । ভারতের প্রতিনিধিত্ব করবে ,কুস্তি লড়াকু হিসেবে কোনো সে এক অলিম্পিকে ।
তাই কোনো চুড়ি পরেনা সে । কাঁচ পাথর কিংবা রেশমী চুড়ি ।
---সুন্দর সুন্দর চুড়িগুলো ডিজাইন করিস্ , একটাও পরতে মন চায়না ?

জানতে চায় রতি । হেসে বলে নীতু : আমি একজনকে মন দিয়েছি । বাইরের থেকে এসেছে । স্মৃতি হারিয়ে এখানে আছে । তোমাকে দেখাবো খন । তাকে আমি কোনোদিন বিয়ে করতে পারবো না কারণ আমি কুস্তি করি ।

দুষ্টুমি করে রতি : বিয়ের পরেও কুস্তিই হয় । একটু অন্যধরণের কুস্তি ।

খুব হাসে নীতু ----আর কুস্তি করলে হাতে বালা পরা চলেনা । আমাদের এই সমাজ তো তোমাদের শিক্ষিত সমাজ নয় । এখানে একবারই হাতের বালা খোলা হয় আর তা হল বৈধব্যের

সময় । কাজেই আমি বিয়ে করে যদি বালা না পরি লোকে ভাববে আমি বিধবা । আর সেটা সম্ভব নয় । কাজেই ওকে আমি বিয়ে করতে পারবো না । আমি অলিম্পিকে যাবোই যাবো । আমার প্রথম প্রেম কুস্তি না সেই ভিনদেশী মানুষ- আমি নিজেই জানিনা ।

মানুষটিকে দেখতে গেলো রতি । সেই মানুষ যে আজ স্মৃতি হারিয়ে এই নির্জন এলাকায় বসবাস করছে । শহর থেকে অনেক দূরে । কোথাও যাবার তাড়া নেই তার । নেই তথাকথিত নীতুর প্রতি কোনো গভীর আকর্ষণও ।

একমনে টিভি দেখে, নাহলে বালার কারিগরের কাজ পর্যবেক্ষণ করে । থাকে একটি কোণার ছোট ঘরে । ঘরের মালিক খুব শ্রদ্ধা করে ।

এখানে -বন থেকে মাশরুম তুলে এনে অনেকে বিক্রি করে । নীতুও আগে সেরকমই করতো । একদিন ওর বিক্রি করা মাশরুম খেয়ে অনেক মানুষ মারা গেলো, বিষক্রিয়া । হয়ত মাশরুমগুলি মানুষের খাদ্য নয় । ওরা গাছ, কাঠে গজানো মাশরুম নিয়ে আসতো । কখনো কখনো উঁইপোকার ঢিপি

ভেঙে । উঁইপোকা নাকি মাশরুম পোষে - ***Termitomyces*** বলে ওদের ।একজাতের পিঁপড়েও নাকি ব্যাঙের ছাতা পোষে । সে আরেক নামের মাশরুম ।

নীতুর বিক্রি করা ছাতায়- কোনো প্রকার বিষ থাকায় মানুষের মরণ হয় । ওকে আর মাশরুম বিক্রি করতে দেয়না তাই ।

ওর বুড়ি মা ,প্রায় কোলকুঁজো , সাঁঝের আলোয় বসে বসে রুটি ভাজে ও বিক্রি করে । রুটিগুলি খুব মোটা মোটা । দুই হাতে চেপ্টে নেয় । বেলে না ।

তারপর কাঠের উনুনে ভাজে । সেই গরম রুটি, তৈরি হয় একটি শস্য থেকে । এরা বলে : জোজোপা ।

রুটিগুলি খুব সুগন্ধী , তাতে ঘরে তৈরি মাখন মাখিয়ে দেয় বুড়ি ।

খুব তাড়াতাড়ি বিকায় । রতি খেয়েছে । পয়সা নিতে চায়নি বুড়ি ।

বলে : আমি রুটি বিক্রি করি পেটের দায়ে । মেয়েটার বন থেকে আনা সবজি বিক্রি বন্ধ হয়ে গেলো । আমরা খাবো কি ? বালার কারখানার মাইনে ও কুস্তির আখড়ায় খরচ করে । আমাকে এইগুলো করতে হয় তাই । কোমড় ভেঙে গেছে আমার তবুও মেয়ের স্বপ্ন সফল করার জন্যে করি ,বড়

কুস্তিগীর হতে চায় সে । গরীবের এত দামী স্বপ্ন কেনা কি উচিৎ ?

এলাকার মানুষ বলে -- ওরা আগে ধনী ছিলো । বুড়ির পূর্বপুরুষ, জমিদার বাড়ির দিওয়ান ছিলো । বুড়ির বিয়ে হয় অন্য গ্রামে ,এক খোঁড়া সৈনিকের সাথে । সেখানে গোপালের মন্দির আছে । জন্মাষ্টমীর সময় সবাই গোপাল হতে চায় । বালগোপাল । জীবন্ত গোপাল । তাকে নিয়ে প্রসেশান বার হয় ।

যে গোপাল হয় তার নাকি ভাগ্য খুলে যায় । বুড়ি, নিজের মেয়েকে মানে নীতুকে নিয়ে চলে আসে । কারণ ওর শ্বশুরবাড়ির লোক, প্রবল জ্বরের মধ্যেও বুড়ির মেয়েকে গোপাল বানাবার জন্য মন্দিরের পুরোহিতের হাতে সমর্পণ করার চেষ্টা করে । তখন ওর মা ,বাপের বাড়ি চলে আসে সন্তানকে নিয়ে । আর যায়না ওদিকে ।

দিওয়ান্‌জী মারা যাবার পর আস্তে আস্তে অবস্থা পড়ে যায় । সম্পত্তি বিক্রি করে খায় । শেষে অভাবে পড়ে । এখন বনজ মাশরুম ,বালা , রুটি এই ওদের আয়ের পথ ।

এখানে একটি মাটির মূর্তি হত আগে । পোড়া মাটির মূর্তি ,নাম লোমি । সেই মূর্তিগুলি ,মানকচু পাতার মতন একধরণের বড় বড় মোটা পাতায় পালিশ করে নিলে সোনার

মতন চক্‌চক করে । ঐ গাছ শুধু এখানেই আছে । গাছের নাম হিতল । ঐ লোমি কারখানায় কিছুদিন বুড়ি কাজ করতো ।

এই এলাকায় আগে নুনের খরা ছিলো । নুন ছিলো না । প্রায় ২০০ কিলোমিটার দূরে লোকে নুন আনতে যেতো । সমুদ্রের জলে । তখন ঐ দিওয়ানজী, সেইসব মানুষকে ফ্রিতে এই রুটি -মাখন আর সাথে বেগুন পোড়া খেতে দিতেন । ভারি ভালোমানুষ ছিলেন উনি । পরে জমিদার ওটাকে প্রথা করে দেন ।

ভীনদেশী সেই যুবক ট্রেনের দুর্ঘটনায় স্মৃতি হারিয়েছে । চেহারা দেখে অভিজাত বলেই মনে হয় । মুখটা অবশ্য কালো । সীসার মতন দেহ ।

আজকাল রতিকে খুব গুরুত্ব দেয় । একদিন রতিকে নাকি প্রপোজ করেছে ।

এলাকার সবাই বলে : ভদ্রলোকের শুধু একজন ঘরণীর দরকার ।

✳

রতির প্রেমে, মানুষটি পাগল । হারুণ সব দেখেশুনে খুব হেসেছে ।

বাস্তবজীবনে হারুণের ছায়া হারিয়ে গেছে । হারুণ যেন চিত্ররূপের এক প্রতিফলন , সযত্নে যা লালিত- রতির মনের গহীনে !

সুর্যের তেজ সহ্য না করতে পেরে, সংজ্ঞার দেহ থেকে ছায়ার জন্মের মতন । হারুণ টেকনিক্যালি ছিলো চিত্ররূপের ছায়া । ভাগ্যিস্ !

হারুণ হারিয়ে গেলো । চিত্ররূপ, চিত্রনাট্যে প্রবেশ করলো আবার । এবার পুরোপুরি রতির হয়ে, রতিরই জন্য ।

তবে মানুষটি এখন লোনাভালায় চলে গেছে । নিষ্কর্মা হয়ে তো সংসার করা চলে না । তাই এক চিক্কির কারখানায় কাজ নিয়েছে । বাদাম চাকির কারখানা আর কি ! মারোয়াড়ির ফার্ম । তার আবার পাথরের বালা তৈরির কোম্পানিও আছে ।

লোনাভালার রোমান্টিক বর্ষায় ভিজে ভিজে, মেঘের আড়ালে চলে যায় দুটি ছায়ামানুষ । আলিঙ্গন আবদ্ধ । কালো ঘন দেয়া, বর্ষণ মুখর- যেন একমনে গেয়ে চলেছে ভালোবাসার গান । কপোত কপোতীর জন্য ।

দুনিয়ায় বোধহয় এই একমাত্র স্ত্রী-- যে চায়না, কোনোদিন তার স্বামীর স্মৃতি ফিরে আসুক । সে বাকি জীবনটা সেলফিশ্ হয়েই কাটাবে ।

নিজের প্রেমকে সময় দিতে ---in sickness and in health, to love and to cherish, till death do us part-----

শিস্টা কার ? হারুণের ? নাকি কোনো অদেখা অস্তিত্বের ? নাকি স্বপ্ন ? মানসিক ব্যাধি তো নয়ই কারণ নাটকের শেষ অঙ্কে মধুর মিলন ঘটেছে ।

শিস্ এর মালিক কি কোনো উপলব্ধি ?

----শিস্ এর মালিক কেউ নয় । শিস্-টি যা রতিকে নতুন জীবন দিয়েছে তা আদতে রতির ইনার ভয়েস । অন্তর আত্মা । যে সবসময় আমাদের পথ দেখাতে আগ্রহী কিন্তু আমরা শুনতে রাজি নই ।

আমরা বাইরে সুখ খুঁজি । আদতে অন্তরেই আছে সুখসমুদ্রের অনন্ত ভান্ডার ।

চোখ বন্ধ করেও যে দেখা যায় তার প্রমাণ রতির অনবদ্য জীবন কাহিনী ।

রতি যদি শিস্‌কে গুরুত্ব না দিতো তাহলে কী হত ?

পাঠক কল্পনা করে দেখুন । কেমন বিচিত্র জীবন হত তখন তার !

মনের তালা খোলার চাবি নিজের কাছেই থাকে শুধু খুঁজে দেখতে হয় একটু ধৈর্য্য ধরে ।

নীতু একটি টালিস্মান তৈরি করেছে । ওর মনের মানুষের মঙ্গল কামনা করে । মন্ত্রপূত চাক্‌তি-টি ,রতিকে দিয়েছে কারণ ওর মনের মানুষকেও তো রতির হাতেই সমর্পণ করছে নীতু!

তার দুইদিকে খোদাই করা আছে নিচের কথাগুলি---

Your mind knows only some things.
Your inner voice, your instinct, knows everything.
If you listen to what you know instinctively, it will always lead you down the right path
----Henry Winkler

There is a voice inside of you
That whispers all day long,
"I feel this is right for me,
I know that this is wrong."
No teacher, preacher, parent, friend
Or wise man can decide
What's right for you--just listen to
The voice that speaks inside.”
— Shel Silverstein

✳